প্রকাশনার ৯৮ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮৩ বর্ষ | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ১৪ রবিঃ সানি, ১৪৪২ হিজরি | ৩০ নবুয়ত, ১৩৯৯ হি. শা | ৩০ নভেম্বর, ২০২০ ঈসাব্দ

The Mahmood Mosque
Ahmadiyya Mosque in Regina, Canada.

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ঢাকা ও চট্টগ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী ২০২০ উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আই.)-এর নিম্নোক্ত দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী বাংলাদেশের সকল আহমদীকে পালনের অনুরোধ করেছেন।

১. প্রত্যেক সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামা'তে স্থানীয়ভাবে সপ্তাহের সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফযরের আগ পর্যন্ত) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার উপলব্ধি করে পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা: ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান: ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ: কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতূবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ: আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ: আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দরূদ শরীফ। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

-তরবিয়ত বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ধৈর্য-সহনশীলতা ও ক্ষমা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ

আল্লাহ্ তা'লার নবী রসূলগণ পূণ্যবান, শতগুণে গুণান্বিত এবং বিনয়ী মানুষ হয়ে থাকেন। যাদের সততা বিনয় সম্পর্কে তাদের যুগ সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু যখনই তারা সমাজ থেকে ভ্রষ্টতা আর অন্যায়কে দূর করে খোদা তা'লার আদের্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন; তখনই সমগ্র বিশ্ব তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের প্রতি অপবাদ দিয়ে হাসি-বিদ্রুপ করতে এবং মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে এবং সর্বপরি হত্যা করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

আমাদের প্রিয় নবী বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি (সা.) সকল মানবীয় গুণাবলীর আধার ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর (সা.) সাথেও একই অত্যাচার নিপীড়ন আর চরম বিরোধিতার আচরণ করা হয়েছে– যার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু শত অত্যাচার নিপীড়ন আর অন্যায় অপবাদ সত্বেও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

"অতএব (হে মুহাম্মদ!) তুমি ধৈর্য ধারণ করো, যেভাবে পূর্ববর্তী দৃঢ়-প্রত্যয়ী নবীরা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" *(সূরা আহকাফ, আয়াত: ৩৬)*

আর মহানবী (সা.) এই নির্দেশের প্রতি পরিপূর্ণ আমল করে মানব ইতিহাসে ধৈর্য আর সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) দৈহিকভাবেও বারবার অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি (সা.) এই সকল অমানবিক নির্যাতন কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য সহ্য করেছেন। সর্বদা অত্যন্ত ধৈর্যও বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার সমীপে বিনয়াবনত থাকতেন। কবি, পাগল, জাদুকর, এবং মিথ্যাবাদীসহ অসংখ্য নোংরা বাক্যে তাঁকে (সা.) সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি (সা.) কেবল সহ্যই করেন নি বরং সেই বিরোধীদের জন্য দোয়া করতেন, **"হে আল্লাহ্ আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও কেননা তারা জানে না– তারা কি করছে।"** *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ্ তার প্রিয় নবী ও বন্ধুর প্রতি এই হীন আচরণ সত্বেও মহানবী (সা.)-এর এই অসমান্য ধৈর্য ধারণে খুশি হয়ে মহানবী (সা.)-কে বলেন, **"নিশ্চই এই হাসি ঠাট্টাকারীদের (শাস্তি দেয়ার) আমিই জন্য যথেষ্ট।"** *(সূরা হিজর: ৯৬)*

হাদীস পাঠে জানা যায়, উমাইয়া বিন খালফ প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)-এর নামে জঘন্য গালি দিত। আবি বিন খালফ গলিত নাড়িভুড়ি মহানবী (সা.)-এর দিকে নিক্ষেপ করে বলত, হে মুহম্মদ! তুমি বলে থাকো মৃত্যুর পর এরকম গলে যাবার পর নাকি আবার আমাদের জীবিত করা হবে। তিনি (সা.) জবাবে বলতেন, **"হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পুনরুত্থিত করবেন এবং আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"** *(ইবনে হিশাম)*

আবু তালেবের মৃত্যুর পর মহনবী (সা.)-এর ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো তীব্রতর হয়ে গিয়েছিল। একবার এক দুর্ভাগা নবী (সা.)-এর মাথায় ময়লা আবর্জনা ঢেলে দেয়। তিনি (সা.) সেই অবস্থায় ঘরে ফিরে আসেন। তার মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.) তার মাথা ধুয়ে দিতেন আর সাথে সাথে কাঁদতেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে সান্তনা দিয়ে বলতেন, **"মা কেদো না! একমাত্রা আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতার নিরাপত্তাদাতা।"** *(ইবনে হিশাম)*

রসূল (সা.)-কে কাবার তাওয়াফ করতেও বাধা দেয়া হতো। একবার তিনি (সা.) কাবায় প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়তে গেলে তাকে বাধা দেয়া হয় এবং বের হয়ে আসতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর দেখা গেছে, মহানবী (সা.) কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে বলেছে, **"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।"** এই হল **'রাহমাতুল্লিল আলামীন'**। এই হল, **'মুর্তিমান ক্ষমা'**।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়েও তিনি ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শণ করেছেন তা জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। শত আঘাতেও যিনি ক্ষমার আচরণ করেছেন, তা স্বর্ণাক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। অতএব মহানবী (সা.)-এর জীবনীই আমাদের আদর্শ। সেই আদর্শেই হোক আমাদের পথচলা।

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩০ নভেম্বর ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

"মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ" ৮
যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ২৫ তবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা**

জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সংর্ধনায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ভাষণ ১৮

মসজিদসমূহ– শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর ২২
ক্যানাডার সাস্কাচুয়ান প্রদেশের রেজাইনা-তে মাহমুদ মসজিদের উদ্বোধন

শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশনা ২৬

পর্ব-৩ ৩০
সুইডেন থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে প্রিয় হুযূর (আই.)-এর মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা ৩২
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ঐশী উত্তরাধিকার আহমদিয়া মুসলিম জামাত তেরগাতী ও একজন পুণ্যাত্মা সৈয়দ মুজবেহীন আলী ৩৪
সৈয়দ সোহেল আহমেদ

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৩৬
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৩৮

কবিতা: ৩৯
জামেয়া আহমদীয়া
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

সংবাদ ৩৯

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪০

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা মারইয়াম-১৯

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿۱۱﴾

১১। সে (অর্থাৎ যাকারিয়া) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে কোন নিদর্শন দাও'। তিনি বললেন, 'তোমার জন্য নিদর্শন[১৭৪৪] হল, তুমি লোকদের সাথে ক্রমাগত তিন রাত (ও তিন দিন) কথা বলবে না।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۱۲﴾

১২। এরপর সে মেহরাব (অর্থাৎ ইবাদতকক্ষ) থেকে বের হয়ে তার জাতির সামনে এলো এবং ইঙ্গিতে[১৭৪৫] তাদের বললো, 'তোমরা সকালসন্ধ্যা (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাক'।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿۱۳﴾

১৩। (আল্লাহ্ বললেন,) 'হে ইয়াহইয়া! তুমি এই কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধর। আর আমরা তাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম,

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۴﴾

১৪। এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোমলতা আর পবিত্রতাও (দান করেছিলাম)। আর সে ছিল মুত্তাকী।

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۵﴾

১৫। আর (সে) পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল এবং কখনো উগ্র (ও) অবাধ্য ছিল না।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿۱۶﴾

১৬। আর তার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) যেদিন সে জন্মেছিল এবং (সে দিনও তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে) যেদিন সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে পুনরুত্থিত করা হবে'[১৭৪৬]।

১৭৪৪। কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে ও প্রশংসায় নিবিষ্ট থাকার জন্য যাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি এই নির্দেশ তাঁর নিঃশেষিত দৈহিক শক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য এক আধ্যাত্মিক উপায়স্বরূপ ছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লিখিত মতে খোদার কথায় অবিশ্বাস করার শাস্তিস্বরূপ তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়েছিল (লুক-১:২০-২২)। কিন্তু তা ঠিক নয়।

১৭৪৫। 'আওহা ইলা ফুলানিন' অর্থ সে প্রকাশ করল বা আদেশ দিল বা অঙ্গভঙ্গি বা সঙ্কেত দ্বারা অনুরোধ করলো অথবা সে তাকে এমনভাবে বললো যে অন্যেরা শুনতে পারলো না (আকরাব)। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানের ৪২নং আয়াতে 'রাময' ওষ্ঠ সঞ্চালনে যোগাযোগ স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কণ্ঠ ব্যবহারে নয়।

১৭৪৬। ইসলাম তার অভ্যুত্থানের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে অতি দ্রুত উন্নতি করেছিল। প্রত্যেক ধর্মমতের লোকদের মধ্য থেকে বহুসংখ্যক লোক বিশেষভাবে খ্রিষ্টানদের বিরাট দল ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিল। তারা ঈসা (আ.) সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্ম তখনো তারা উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি, সেহেতু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরবর্তীকালে তাদের মিথ্যা ধারণা ও ভুল বিশ্বাস মুসলিম গ্রন্থাবলীতে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে পরবর্তীকালে তা মুসলমানদের বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই সকল বিশ্বাস বা ধারণা উদ্ভব করা হয়েছিল ঈসা (আ.)-কে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে –এমন ব্যক্তিত্বে যা মানবীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অজ্ঞতাপূর্ণ এই সমস্ত বিশ্বাস কুরআন করীম তফসীরাধীন এই সূরায় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই সূরা এবং সূরা আলে ইমরান হযরত ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.)-এর মধ্যে তুলনা করে দেখিয়ে দিয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে এমন কোন কিছুই ছিল না যা তাঁকে অন্যান্য সকল নবী থেকে পৃথক করে দিয়েছিল (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃ: ১৫৬৫)।

হাদীস শরীফ

মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত

কুরআন:

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ

"এরপর তোমরা যখন নামায শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে শোয়া অবস্থায় তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর... ।" *(সূরা আন নিসা: ১০৪)*

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

"যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাত হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে.. ।" *(সূরা আলে ইমরান: ১৯২)*

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۹﴾

"যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। মনে রেখো! আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" *(সূরা আর্ রা'দ: ২৯)*

হাদীস:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, **"যখন রাতের এক তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ তা'লা আকাশের নিম্নস্তরে চলে আসেন এবং বলেন, আমি মালিক, আমাকে কে ডাকছে, যার ডাকের উত্তর আমি দিব, আমার থেকে কে চাচ্ছে, যাকে আমি দিব, আমার থেকে কে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, যাকে আমি ক্ষমা করব, এরকম অবস্থা সকাল পর্যন্ত থাকে।"** *(তিরমিযি)*

অপর এক হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "রোযার রাত্রে ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তোমার উম্মতকে আমার তরফ হতে সালাম পৌঁছে দিও এবং তাদেরকে বলো, জান্নাতের মাটি খুব উর্বর এবং পানি খুব সুমিষ্ট, কিন্তু সেখানে কোন বৃক্ষ নেই। তোমরা যদি জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করতে চাও, তাহলে **'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার'** বারবার পাঠ কর।"

আরেক স্থানে মহানবী (সা.) বলেন, "আদম সন্তানকে যিকরে ইলাহী ব্যতিরেকে অন্য কোন আমল আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে না।"

ব্যাখ্যা:

কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মানব জাতির সার্বিক-কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত। 'যিকরে ইলাহী'-দ্বারা আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতের অধিকারী হওয়া যায়। তাই আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মানব সন্তানকে একমাত্র যিকরে ইলাহীই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি সর্বদা যিকরে ইলাহীতে রত থাকে, তার হৃদয় খোদার ভয়ে ভীত থাকবে এবং ঐ সমস্ত কর্ম হতে বিরত থাকবে, যার দরুণ খোদা অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্‌র যিকর হৃদয়কে নরম ও কোমল করে এবং এতে রূহানী উন্নতি লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বেশি বেশি 'যিকরে ইলাহী' করার তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:
আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

–হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক হয়ো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছ না? দেখ, খোদা বিভিন্নভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে, তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তিপূজায় রত, তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা, তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে, তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন– যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা, যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হল, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজাড় করা মানবকূল-প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকাশ্য-রহস্য, যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হল, শেষ-যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে, যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান'-দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব-গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছলচাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার-প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য অবশিষ্ট থাকবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে, যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত হবে বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ যখন উন্মাদের ন্যায় তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃ: ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৪৭তম কিস্তি)

ষষ্ঠতম কারণ হল, 'কিতাবিল্লাহ্' পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব 'বুখারী' হাদীসগ্রন্থে আসল মসীহ্ হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়মের দৈহিক অবয়ব এবং আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্র দৈহিক অবয়ব একটি আরেকটির থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত ছয়টি প্রকৃষ্ট কারণের আলোকে প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণিত হয় যে, আগমনকারী মসীহ্ কখনও সেই প্রকৃত মসীহ্ নন যার প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। বরং তিনি তাঁর সদৃশ হবেন এবং সেই সময়ে তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি ছিল যখন মুসলমানদের মাঝে কোটি কোটি লোক ইহুদীদের সদৃশে পরিণত হবে। এতে করে খোদা তা'লা এ উম্মতের উভয় প্রকার সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রকাশিত করেন। এমনটা নয় যে, এ উম্মত কেবল ইহুদীদের নাপাক রূপ ধারণে সক্ষম হবে এবং সংশোধনার্থে বনি ইসরাঈলীদের মধ্যকার মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম আবির্ভূত হবেন। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে সেই মুকাদ্দাস ও রূহানী শিক্ষক এবং পবিত্র মহানবী (সা.)-এর চরম অবমাননা সাব্যস্ত হয় যিনি এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, এ উম্মতে বনি ইসরাঈলী নবীগণের সদৃশ সৃষ্টি হবেন।

যদি বলা হয় যে, আসল মসীহ্ হযরত ঈসা যখন আর আসবেন না, বরং তার সদৃশ-মসীহ্ আসবেন, তখন এ কথাই বলা উচিত ছিল যে, তাঁর সদৃশ আগমন করবেন। এর উত্তর হল, এটা সুবিদিত এক সাধারণ বাচনভঙ্গী যে, সদৃশ ও সাদৃশিক উভয়ের মাঝে যখন পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে তখন বক্তার ইচ্ছা হলে উল্লিখিত একজনকে অপরজনের ওপর প্রযোজ্য করে থাকে, যাতে উভয়ের মাঝে পরস্পর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, এক বৈঠকে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর আগমনে বলা হল: 'দেখুন, এ যে ইমাম আহমদ হাম্বল (রহ.) এসেছেন।' আর তেমনি সচরাচর বলা হয়, 'এ ব্যক্তি একটা বাঘ', 'বাঘের মত' বলা হয় না। অথবা বলা হয়ে থাকে, 'সে নোঁশেরওয়ান' অথবা যেমন বলা হয়, 'সে হাতেম।' (হাতেমের মতো বলা হয় না)। যেমন, কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি গর্ধব বা বানর।' এমনটি বলে না, 'তুমি গর্ধবের মতো বা বানরের মতো।' কেননা তার অন্তরে যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যমূলক মর্ম বিরাজ করে সেটা একথাগুলো থেকে প্রকাশ পায় না। 'ফা-তাদাব্বার' (অর্থ– 'অতএব, গভীরভাবে ভেবে দেখ' –অনুবাদক)।

"উম্মতে-আহমদ (সা.) নিহাঁ দারদ দো যিদ্‌রা দর্ ওয়াজুদ।
মি তুয়ান্দ শুদ্ মসীহা, মি তুয়ান্দ্ ইহুদ ॥
'যুম্‌রায়ে ইশাঁ হামা বদ্‌তীনঁ জায়ে-নাঙ।
যুম্‌রায়ে-দিগার বজায়ে আম্বিয়া দারদক্বয়ূদ ॥"

অর্থাৎ, 'আহমদ (সা.)-এর উম্মত নিজ সত্তায় দু'টি স্ববিরোধী বিষয় সংগোপনে ধারণ করে। তাদের মধ্যকার কোন একজন মসীহ্ স্বরূপ হতে পারবেন, আবার তারা ইহুদী স্বরূপও হতে পারে ॥

তাদের মধ্যকার একটি শ্রেণী বদ-স্বভাব মানুষের জন্যও কলঙ্ক ও লজ্জার কারণ, তাদের আরেক শ্রেণী নবীগণের স্থলাভিষিক্ত!

কোন কোন ব্যক্তি অতি সরলতাবশতঃ বলেন যে, (বাইবেলের) 'রাজাবলি' পুস্তকে লিখা আছে, 'এলিয়া আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন।' অতএব, মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আকাশে উত্থিত হওয়ায় কি আপত্তি আছে? তাদের জানা আবশ্যক যে, এলিয়াকেও প্রকৃতপক্ষে পার্থিব দেহসহ আকাশে উঠানো হয় নি। কাজেই হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম তখনই এলিয়ার মৃত্যুবরণের দিকে ইঙ্গিত দান করে ইহুদীদের সেই মিথ্যা আশা ভঙ্গ করেছিলেন– যা তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেরা পোষণ করেছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'এলিয়া কখনও ফিরে আসবে না।' আর এটা স্পষ্ট যে,

তাকে যদি পার্থিব দেহসহ উঠানো হতো, তাহলে পৃথিবীর মাটি (তথা ভূপৃষ্ঠের) দিকে তার ফিরে আসা আবশ্যিক ছিল। কেননা লিখা আছে, পার্থিব দেহ পৃথিবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।' আল্লাহ্ বলেন, **"মিনহা খালাকনাকুম, ওয়া ফিহা নুয়ীদুকুম"** (সূরা তাহা: ৫৬)। এলিয়া কি আকাশেই মৃত্যুবরণ করবেন? অথবা **"কুল্লুমান আলাইহা ফান"** (ভূপৃষ্ঠস্থ সবাই নশ্বর" (সূরা 'রহমান')] এলিয়া কি এর বাইরে থাকবেন? যদি ভেবে দেখতেন তবে বুঝতে পারতেন, 'রাজাবলি' পুস্তকে উল্লিখিত 'নিচে পড়ে যাওয়া চাদর'– এটাই ছিল তাঁর পার্থিব দেহ যা তিনি ছেড়ে যান এবং (আখেরাতের) নুতন পোষাক পরিধান করেন। *('রূহানী খাযায়েন তৃতীয় খণ্ডের ৫১৩ ও ৫১৪ পৃষ্ঠায় উর্দু ভাষায় রচিত সুদীর্ঘ কবিতাটি বাংলা বর্ণাক্ষরে তুলে ধরা হল, যাতে দর্শক এটি সহজে পাঠ করে বেশি উপকৃত হতে পারেন– অনুবাদক)*

উর্দু কবিতা বাংলা বর্ণাক্ষরে

১। কিঁউ নাহিঁ লোগো তুম্‌হেঁ হাক্ব কা খিয়াল?
দিল্ মেঁ উঠ্‌তা হ্যায় মেরে সও-সও উবাল ॥

২। ইবনে-মরিয়ম মর্ গিয়া হাক্ব কি কসম।
দাখিলে-জান্নাত হুয়া, উওহ্ মোহ্‌তারাম ॥

৩। মারতা হ্যায় উস্‌কো ফুরক্বাঁ সরবসর।
উস্‌কে মর জানে কি দেতা হ্যায় খবর ॥

৪। উওহ্ নাহিঁ বাহির রাহা আম্‌ওয়াত সে।
হো গিয়া সাবেত ইয়ে তিস আয়াত সে ॥

৫। কোই মুর্দোওঁ সে কাভি আয়া নেহীঁ।
ইয়ে তো ফুরক্বাঁ নেভি বাত্‌লায়া নাহীঁ ॥

৬। আহ্‌দ শুদ্ আয্ কির্দগার বে-চুগুঁ।
গাওর্ কর দর্ 'ইন্নাহুম্ লা ইর্‌জিউন' ॥

৭। আয় আযীযো! সোচ্ কর্ দেখো যরা
মওত্ সে বাচ্‌তা হ্যায় কোই দেখা ভালা ॥

৮। ইয়ে তো রাহ্‌নে কা নাহী পিয়ারো মাকাঁ।
চল্ বসে সব্ আম্বিয়া ওয়া রাস্‌তাঁ ॥

৯। হাঁ, নাহীঁ পাতা কোই ইস্‌সে নাজাত।
ইউঁহি বাতোঁ হ্যাঁয় বানায়ীঁ ওয়াহিয়াত ॥

১০। কিউঁ তুমহেঁ ইন্‌কার পর্ ইস্‌রার হ্যায়?
হ্যায় ইয়ে দীন ইয়া সীরাতে-কুফ্‌ফার হ্যায়?

১১। বর্‌খিলাফে নস্ ইয়ে কিয়া জোশ হ্যায়?
সোচ্ কর্ দেখো আগার কুছ্ হোশ হ্যায় ॥

১২। কিঁউ বানায়া ইব্‌নে-মরইয়াম কো খোদা?
সুন্নাতুল্লাহ্ সে উওহ্ কিঁউ বাহির রাহা ?

১৩। কিঁউ বানায়া উস্‌কো বা-শানে কবীর?
গয়েব্‌দান ও খালেক্ব ও হাই ও ক্বাদীর?!

১৪। মর্ গায়ে সব্ পর্ উওহ্ মর্‌নে সে বাচা!
আব্ তলক আয়ী নাহীঁ উস্ পর ফানা !!

১৫। হ্যায় ওয়াহি আক্‌সর্ পারেন্দোঁকা খোদা।
ইস্ খোদাদানী পে তেরে মার্‌হাবা ॥

১৬। মৌলবী সাহেব! এহি তৌহীদ হ্যায় !
সাচ্ কাহো কিস্ দেব কি তকুলীদ হ্যায়?

১৭। কিয়া এহী তৌহিদে-হক্ব কা রায থা?
জিস্ পে বরসোঁ সে তুমঁহে এক্ নায থা ॥

১৮। কিয়া বশর মেঁ হ্যায় খুদায়ী কা নিশাঁন?।
আল-আমাঁন এ্যায়সে গুমা'নোঁ সে
আল্-আমাঁন ॥

১৯। হ্যায় তায়াজ্জুব আপ্‌কে ইস্ জোশ পর্।
ফেহ্‌ম, পর্ আওর আক্বল পর্
আওর জোশ পর্ ॥

২০। কিউঁ নযর্ আতা নাহীঁ রাহে- সাওয়াব?
পড়ু গায়ে কেয়সে ইয়ে আখোঁ পর্ হিজাব ॥

২১। কিয়া এহী তা'লীমে-ফুর্ক্বাঁন হ্যায় ভালা!
কুছ্ তো আখের চাহিয়ে
খাওফে-খোদা !!

২২। মো'মিনোঁ পর্ কুফ্‌র কা কারনা গুমাঁন।
হ্যায় ইয়ে কিয়া ঈমানদারোঁ কা নিশাঁন ॥

২৩। হাম্ তো রাখতে হ্যাঁয় মুসলমানোঁ
কা দীন।
দেল্ সে হ্যাঁয় খুদ্দামে খত্‌মুল্
মুরসালীঁন ॥

২৪। শির্‌ক আওর বিদ্‌আত সে হাম্
বেযার হ্যাঁয় ॥
খাকে-রাহে-আহমদে মুখ্‌তার হ্যাঁয় ॥

২৫। সারে হুক্‌মোঁ পর্ হামেঁ ঈমান হ্যায়।
জান ও দিল ইস্‌রাহ্ পর্ কুরবান হ্যায় ॥

২৬। দে চুকে দিল্ আব্ তনে-খাকী রাহা।
হ্যায় এহী খাহিশ্ কেহ্ উওহ্ ভি হো
ফিদা ॥

২৭। তুম্ হামেঁ দেতে হো কাফির কা খিতাব।
কিউঁ নহীঁ লোগো! তুমঁহে
খওফে-ইক্বাব? ॥

২৮। সাখ্‌ত্ শোরে উফতাদ্ আন্দার
যমীঁন।
রহ্‌ম কুন্ বর্ খাল্‌ক আয়
জাঁ-আফ্‌রীঁ ॥

২৯। কুছ্ নমুনা আপ্‌নি ক্বুদরত্ কা দিখা।
তুঝকো সব্ ক্বুদ্‌রত্ হ্যায়
রাব্বুল্-ওয়ারা ॥... *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

Smile Aid
your complete dental healthcare
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU). PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A. Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-‘গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ২৫ তবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা’ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত বেলাল (রা.)-র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ্ বিন বুরায়দাহ্ (রা.) নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন প্রত্যুষে মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, হে বেলাল! তুমি জান্নাতে আমার অগ্রে থাক, এর কারণ কী? গতকাল সন্ধ্যায় আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করি তখন আমি আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, আমি যখনই আযান দেই তখন দু’রাকাত নফল নামায পড়ি আর যখনই আমার ওযু ভেঙে যায় আমি (আবার) ওযু করে নেই। আমি মনে করি, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার জন্য দু’রাকাত (নামায) পড়া আবশ্যক করা হয়েছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে এটিই কারণ হবে। অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তুমি সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক যে কাজ করেছ তা

কী? কেননা আমি বেহেশ্‌তে আমার সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, দিনে ও রাতে যখনই আমি ওযু করেছি, আমি সেই ওযুর পর যতটা আমার জন্য সম্ভব ছিল অবশ্যই নামায পড়েছি। আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক আর কোন কাজ আমি করিনি, এটি বুখারীর হাদীস।

এর অর্থ এটি নয় যে, মহানবী (সা.)-এর চেয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন, বরং এর অর্থ হল, পবিত্রতা ও গোপন ইবাদতের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন যে, জান্নাতেও তিনি সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর সাথে রয়েছেন যেভাবে পৃথিবীতে ছিলেন। পূর্বের একটি রেওয়ায়েতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ঈদের দিন হযরত বেলাল (রা.) বর্শা হাতে মহানবী (সা.)-এর সামনে হাঁটতেন এবং কিবলামুখী করে বর্শা গেঁড়ে দিতেন আর মহানবী (সা.) সেখানে ঈদের (নামায) পড়াতেন। যাহোক, তার পবিত্রতা এবং ইবাদতের কারণে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতেও তার এই মর্যাদা বহাল রেখেছেন আর মহানবী (সা.) তাকে নিজের সাথে একটি দিব্যদর্শনে দেখেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, রাতের বেলা আমাকে যখন জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এই পদধ্বনি কার? জিব্রাঈল (আ.) বলেন, বেলালের। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হায়! আমি যদি বেলালের মায়ের গর্ভে জন্ম নিতাম, হায়! বেলালের পিতা যদি আমার পিতা হতো আর আমি বেলাল সদৃশ হতাম। কত উন্নত মর্যাদা সেই বেলালের যাকে এক সময় তুচ্ছ জ্ঞান করে পাথরের ওপর টানাহ্যাঁচড়া করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন যে, হায়! আমি যদি বেলাল হতাম।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের উল্লেখ করে একস্থানে এভাবে লিখেছেন যে, বেলাল বিন রাবাহ্ (রা.) উমাইয়্যা বিন খালাফ এর হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় আযান দেওয়ার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিনি আযান দেওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে যখন সিরিয়া বিজিত হয় তখন একবার হযরত উমর (রা.)'র অনুরোধে তিনি পুনরায় আযান দেন। (আযান শুনে) মহানবী (সা.)-এর যুগ সবার সামনে এসে যায়। অতএব তিনি স্বয়ং এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবীরা এত বেশি কাঁদেন যে তাদের হেঁচকি আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত উমরের হযরত বেলালের প্রতি এত ভালোবাসা ছিল যে, যখন তিনি (রা.) মারা যান তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আজকে মুসলমানদের নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি ছিল দরিদ্র এক হাবশী ক্রীতদাস সম্বন্ধে যুগের বাদশাহ্‌র উক্তি।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত-

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ﴿۴۷﴾

(সূরা কাহাফ: ৪৭)

এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত বেলাল (রা.)-এর উল্লেখ করে বলেন, অবশিষ্ট কেবল একটি জিনিষই থাকবে, আর তা হল, আল বাকিয়াতুস্ সালেহাত। আল্লাহ্‌র জন্য কৃত কর্মই অবশিষ্ট থাকবে। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আজকে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বংশধর কোথায়? বাড়িঘর কোথায়? কোন সম্পদ নাই, বংশধর নাই, আমরা জানি না কোথাও তার বংশধর আছে কিনা? কিন্তু আমরা যারা তাঁর বংশধরও দেখি নি, বাড়ি-ঘরও দেখি নি, সম্পদও দেখি নি; আমরা যখন তার নাম নেই, তখন আমরা বলি হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'লা আনহু। তিনি (রা.) বলেন, কিছু দিন পূর্বে একজন আরব এসে বললেন, আমি বেলাল (রা.)-এর বংশধর। জানি না তিনি সত্য বলেছেন নাকি মিথ্যা; কিন্তু আমার তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল, কেননা তিনি সেই ব্যক্তির বংশধর যিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে আযান দিয়েছিলন। আজ বেলালের বংশধর কোথায়? আমরা জানি না তাঁর (রা.)'র বংশ আছে কিনা; আর যদি থাকেও তবে তারা কোথায়? তাঁর বাড়ি কোথায়? তাঁর (রা.)'র কোন সম্পত্তি আমরা দেখি না। তাঁর সম্পত্তি কোথায়? কিন্তু তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে যে আযান দিয়েছিলেন সেই স্মৃতি আজও অম্লান এবং তা চিরদিন অমর থাকবে। এই পুণ্যগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। হযরত বেলাল (রা.)-কর্তৃক চুয়াল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহায়নে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) ৪টি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত হল, মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাত তিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল। তারা হলেন– আলী, আম্মার এবং বেলাল (রা.)।

একবার হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার সময় হযরত বেলাল (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই যে বেলাল, তিনি হলেন আমাদের নেতা। হযরত আবু বকর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন, হযরত বেলাল (রা.) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, বেলাল আমাদের নেতা আর তিনি হযরত আবু বকর (রা.) কৃত পুণ্যকর্মগুলোর একটি, কেননা তিনি (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে ক্রয় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন।

হযরত আয়েয বিন আমর থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সালমান, হযরত সুহায়েব এবং হযরত বেলাল (রা.)-র কাছে আবু

সুফিয়ান আসেন, তারা এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তখন তারা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! খোদার তরবারি আল্লাহ্‌র শত্রুর ঘাড়ে যথাস্থানে আঘাত করতে পারে নি। বর্ণনকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কুরায়েশের সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? তারা যখন বলছিলেন যে, আমরা সঠিকভাবে এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেই নি- একথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভালো লাগে নি; তিনি বলেন, তোমরা কুরায়শের নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং একথা জানান। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমি হয়ত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক তাহলে নির্ঘাত তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের কাছে যান এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি। হযরত আবু বকর (রা.) এই চিন্তা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে বকাঝকা করবেন বা বারণ করবেন, কিন্তু উল্টো মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তাদের মনে কষ্ট দিয়েছ। এখানে আবু বকর (রা.)-এর মহান মর্যাদা দেখুন! তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেসব দরিদ্র লোকদের কাছে ফিরে যান এবং তাদেরকে বলেন, প্রিয় ভাইসকল! আমি তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েছি? তারা বলেন, না না ভাই! আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি কৃপা করুন, এমন কিছুই ঘটে নি, আমাদেরকে আপনি অসন্তুষ্ট করেন নি বা মনে কষ্ট দেন নি।

হযরত আবু মূসা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পাশেই ছিলাম যখন তিনি (সা.) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত বেলাল তাঁর সাথে ছিলেন; এক মরুবাসী মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আমার সাথে কৃত আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করবেন না? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে বলে আপনি অনেকবারই 'আবশির' তথা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু মূসা এবং হযরত বেলালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেমনটি কারো প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হলে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি তিনি সেই বেদুঈন থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি উক্ত দু'জনের দিকে মুখ করে বলেন, সে সুসংবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি তাকে সুসংবাদ দিচ্ছিলাম আর সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব, তোমরা দু'জন এই সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর মহানবী (সা.) একটি পেয়ালা চেয়ে আনেন যাতে পানি ছিল। এই পানি দিয়ে তিনি তার উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কুলি করেন। এরপর বলেন, তোমরা এটি থেকে পান কর এবং তোমরা উভয়েই নিজেদের মুখ ও বুকে এই পানি ঢেলে নাও এবং আনন্দিত হও। অতঃপর তারা দু'জনই সেই পাত্র হাতে নেন এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে যেভাবে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তারা করেন। পর্দার আড়াল থেকে হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাদেরকে ডেকে বলেন, তোমাদের পাত্রে যা আছে তা থেকে তোমাদের মায়ের জন্যও কিছুটা রেখো, অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর জন্যও কিছুটা বাঁচিয়ে রেখো। ফলে, তারা উভয়ে তাঁর জন্য তা থেকে কিছুটা রেখে দেন।

হযরত আলী বিন আবি তালেব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্‌ তা'লা সাতজন করে নেতা বা অধিনায়ক দান করেন, আর আমি চৌদ্দজন অর্থাৎ দ্বিগুণ নেতা বা অধিনায়ক প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বললাম, তারা কারা? হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি, আমার দুই পুত্র, হযরত জাফর, হযরত হামযা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত মিক্বদাদ, হযরত আবু যর, হযরত আম্মার এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসঊদ (রা.)।

হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না উত্তম মানুষ, সে সব মুয়াজ্জিনের নেতা। কেবল মুয়াজ্জিনরাই তার অনুসরণকারী হবে আর কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবে মুয়াজ্জিনরাই। হযরত যায়েদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, বেলাল কতই না ভালো মানুষ! শহীদ ও মুয়াজ্জিনদের নেতা তিনি, আর কিয়ামতের দিন হযরত বেলাল সবচেয়ে দীর্ঘ গৃবাবিশিষ্ট হবেন, অর্থাৎ তিনি অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেন, জান্নাতের উটনীগুলোর মধ্য থেকে একটি উটনী বেলালকে দেয়া হবে আর তিনি তাতে আরোহন করবেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলেন, এখানে বেলাল আছে কি? আমি উত্তরে বলি, না, আপনি ঘরে আসুন। মহানবী (সা.) বলেন, মনে হয় তুমি বেলালের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি বলি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন আর কথায় কথায় বলেন যে, মহানবী (সা.) একথা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) একথা বলেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত বেলালের স্ত্রীকে বলেন, বেলাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে যে কথাই বলে তা অবশ্যই সত্য হবে আর বেলাল তোমার কাছে ভুল কথা বলবে না, তাই বেলালের প্রতি তুমি কখনোই অসন্তুষ্ট হয়ো না, অন্যথায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন কর্ম গৃহীত হবে না যতক্ষণ তুমি বেলালকে অসন্তুষ্ট রাখবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের দৃষ্টান্ত

মৌমাছির ন্যায়, যা মিষ্টি ফল এবং তিক্ত লতাগুল্ম থেকেও রস আহরণ করে, কিন্তু যখন মধু হয় তখন পুরোটাই সুমিষ্ট হয়ে যায়।

হযরত বেলাল (রা.)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রা.) যখন বিছানায় শুতেন তখন দোয়া পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা তাজাওয়ায আন সাঈয়েআতি ওয়াহ্‌যুরনি বেইল্লাতি'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার ভুলত্রুটি মার্জনা কর আর আমার দোষত্রুটির বিষয়ে আমাকে অক্ষম মনে কর।

হযরত বেলাল (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, হে বেলাল! দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর আর সম্পদশালী অবস্থায় যেন মৃত্যুবরণ করো না। আমি নিবেদন করলাম দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব আর সম্পদশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব না– এ কথাটি আমি বুঝতে পারি নি, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাকে যে রিয্‌ক দান করা হয় তা তুমি সঞ্চয় করে রেখো না আর যে জিনিসই তোমার কাছে চাওয়া হয় তা দিতে তুমি অস্বীকৃতি জানিও না। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যদি এমনটি না করতে পারি তাহলে কী হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এমনই করতে হবে অন্যথায় ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অর্থাৎ কোন ভিখারীকে খালি হাতে ফেরাবে না। এছাড়া এমন যেন না হয় যে, শুধু সঞ্চয় করবে আর ব্যয় করবে না। অর্থাৎ ব্যয় করাও আবশ্যক।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বিশ হিজরীতে সিরিয়ার দামেস্কে হযরত বেলাল (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। কারো কারো মতে তিনি হালাব-এ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ষাটের অধিক। কারো কারো মতে হযরত বেলাল ১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দামেস্কের কবরস্থানে বাবুস্ সগীরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর সম্মান ও পদমর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (এর কিছু কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, কিন্তু কথার ধারাবাহিকতায় এখানে প্রথম দিকের কিছু কথা সম্ভবত পুনরায় চলে আসতে পারে) হযরত বেলাল (রা.) হাবশী (বা ইথিওপিয়ান) ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না, আরবী বলার সময় অনেক ভুল করতেন। উদাহরণস্বরূপ ইথিওপিয়ার মানুষ 'শীন'-কে 'সীন' বলত। যেমন– বেলাল (রা.) আযান দেওয়ার সময় যখন 'আশহাদু'কে 'আস্‌হাদু' বলতেন তখন আরবের লোকেরা হাসাহাসি করত, কেননা তাদের মাঝে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পাওয়া যেত। অথচ অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ তারা নিজেরাও বলতে পারত না। যেমন– আরবরা রুটিকে রুটি বলতে পারে না, বরং রুতি বলে। তারা 'ট'–এর পরিবর্তে 'ত' বলবে এবং 'চুরি'কে বলবে 'জুরি'। কেননা তারা 'চ' বলতে পারে না, তাই 'জ' বলবে। তিনি (রা.) বলেন, যেভাবে অনারবরা আরবী ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, ঠিক একইভাবে আরবরাও অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের নেশায় মত্ত হয়ে তারা একথা ভাবে না যে, আমরাও তো অন্যান্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-এর আস্‌হাদু বলায় অন্যদের হাসাহাসি করতে দেখে বলেন, তোমরা বেলালের আযান শুনে হাস? অথচ সে যখন আযান দেয় তখন আরশে আল্লাহ্ তা'লা আনন্দিত হন। তোমাদের আশ্‌হাদু অপেক্ষা তার আস্‌হাদু বলা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিক প্রিয়। বেলাল (রা.) হাবশী বা ইথিওপিয়ান ছিলেন আর সেই যুগে ইথিওপিয়ানদের কৃতদাস বানানো হতো, বরং বিগত শতাব্দী তথা নিকটবর্তী শতাব্দীগুলোতেও দাস বানানো হয়েছে এবং আজ অবধি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যাদের নিকট কোন ভিন্ন জাতি অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত গণ্য হতে পারে। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে সকল জাতি আল্লাহ্ তা'লার সমান সৃষ্টি। গ্রীক এবং ইথিওপিয়ানদেরও তিনি সেভাবেই ভালোবাসতেন যেভাবে আরবদের ভালোবাসতেন। তাঁর কাছে কোন পার্থক্য ছিল না। আফ্রিকানরাও তেমনই প্রিয় ছিল যেমনটি ছিল আরবরা বা গ্রীকরা। এই ভালোবাসাই সেসব ভিন জাতির হৃদয়ে তাঁর (সা.) জন্য এমন ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিল, যে বিষয়টি আরবের অনেক মানুষের জন্য অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর এই ভালোবাসার কারণেই সেসব লোকের হৃদয়েও মহানবী (সা.)-এর প্রতি এক গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যাদের মাঝে বিচক্ষণতা ছিল না, যাদের সেই ভালোবাসার উপলব্ধি ছিল না এবং যাদের বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার ভেদ ও রহস্যের জ্ঞান ছিল না তারা বুঝতে পারত না যে, এটি কীভাবে হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় আরব জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার আরবদের মাঝেও কুরায়েশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা অন্যান্য আরব জাতিগুলোকে তুচ্ছ ও নীচ মনে করত। তাঁর গোত্র ছিল সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্র, ইথিওপিয়ানদের সাথে তাঁর কীইবা সামঞ্জস্য ছিল? মহানবী (সা.)-এর কোন জাতি বা গোত্রের প্রতি ভালোবাসা থাকার হলে তা বনু হাশেমের প্রতি থাকা উচিত ছিল, তাঁর যদি কারো প্রতি ভালোবাসা থাকা বাঞ্ছনীয় হতো তাহলে কুরায়েশের প্রতি থাকা উচিত ছিল বা আরবদের প্রতি থাকা উচিত ছিল, কেননা তারা তাঁর স্বজাতি ছিল, এজন্য এসব মানুষেরও তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত ছিল। ভিন জাতির হৃদয়ে, যাদের সাম্রাজ্যকে তাঁর সৈন্য-সামন্তরা পদদলিত করেছিল, যাদের জাতীয় নেতৃত্বকে

ইসলামি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল (তাদের সাথে) কীভাবে ভালোবাসা হতে পারত? ভিন জাতিদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তারা পরাজিত হয়েছে এবং তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের মাঝে এক গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। এটি কীভাবে সৃষ্টি হল? তাঁর প্রতি তো তাদের শত্রুতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে? এর জন্য প্রথমে আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতির সেই ভালোবাসাকে কিছুটা খতিয়ে দেখি যা তাদের মনিবের প্রতি তাদের ছিল। তিনি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) যখন গ্রেফতার হন তখন তাঁর বিশেষ শিষ্য পিতরকে, যাকে তিনি তাঁর পর খলীফাও মনোনীত করেছিলেন, সৈন্যরা জিজ্ঞেস করে, তুমি তার পিছনে পিছনে কেন আসছ, মনে হয় তুমিও তার সাথি? সৈন্যদের সন্দেহ হয় যে, তুমিও যেহেতু তার পিছনে পিছনে আসছ, তাই তুমিও তার সাথে যুক্ত আছ। তখন সে তাড়াতাড়ি বলে, আমি তার অনুসারী নই (ভয় পেয়ে যায়), আমি তো তাঁকে অভিসম্পাত করি। শুধু অস্বীকারই করে নি বরং অভিসম্পাত করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর শিষ্যরা অবশ্যই ভালোবাসতেন। এমন লোকও হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী বা শিষ্য ছিলেন যারা তাঁকে ভালোবাসতেন। পরবর্তীতে পিতরকেও রোমে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল আর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মৃত্যুকেও বরণ করে নেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্যের কথা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন শূলে চড়ানো হয় তখন তার ঈমান দৃঢ় ছিল না। তখন তো তিনি দু-চারটি চড়-থাপ্পড়কে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে শূলের মৃত্যুকেও তিনি সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। যাহোক, এটি সেই ভালোবাসার একটি চিত্র ছিল যা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাঁর জাতির ছিল। এখন তাঁর জাতির বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী দাসদের প্রতি যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে, তারা তাঁরই হয়ে গেছেন। বেলাল একজন ইথিওপিয়ান দাস ছিলেন, তার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, তা আমরা একটু খতিয়ে দেখি। বাহ্যত কোন কোন মানুষের নিজ প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাদের ভালোবাসা একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতি, হাবশী ক্রীতদাস হওয়ায় যাকে কেবল কুরায়েশরাই নয় বরং সমগ্র আরব পর্যন্ত ঘৃণা করত, (তার প্রতি) যে ধরনের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা কি কেবল সাধারণ উদারতার চেতনায় ছিল? উদারতা ছিল যে, ভালোবাসতে হবে, তার মনস্তুষ্টি করতে হবে, কেবল সেজন্যই ছিল, না-কি এটি সত্যিকার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল? এটি কি লোকদেখানো ভালোবাসা ছিল, নাকি প্রকৃত ভালোবাসা ছিল? হযরত বেলাল (রা.)-ই এটি পরীক্ষা করতে পারেন, আমরা নই। এর জন্য হযরত বেলালের কাছে যেতে হবে। এ ঘটনা ঘটার পর ১৩০০ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, আমাদের জন্য এটি যাচাই করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? দেখতে হবে, হযরত বেলাল (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশকে কী মনে করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ভালোবাসাকে হযরত বেলাল (রা.) কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন, তিনি এটিকে কী মনে করেছেন? এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, আমি নিজে কী মনে করি। এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী শতাব্দীর লোকেরা কী বুঝেছে। এখানে প্রশ্ন এটি নয় যে, এর পূর্ববর্তী শতাব্দীর লোকেরা কী মনে করতেন, আর এখানে প্রশ্ন এটিও নয় যে, স্বয়ং সাহাবীগণ কী বুঝেছেন। এসব কথা বাদ দাও যে, অন্যরা কী বুঝেছে বা মহানবী (সা.)-এর যুগের সাহাবীরা কী মনে করতেন। রবং আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং বেলাল (রা.) কী বুঝেছেন। প্রশ্ন হল, মহানবী (সা.)-এর সেই ছোট্ট একটি বাক্য, ইতিপূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে; তা হল তোমরা তার আস্‌হাদু বলায় হাসাহাসি কর? অথচ তার আযান শুনে আল্লাহ্ তা'লাও আরশে আনন্দিত হন। তিনি তোমাদের আশ্‌হাদু অপেক্ষা তার আস্‌হাদুকে অধিক মূল্যায়ন করেন। এটি কেবল মনস্তুষ্টি ও উপেক্ষার ছলে ছিল, নাকি গভীর ভালোবাসার ভিত্তিতে ছিল? সাময়িকভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি (সা.) কোন কথা বলেছিলেন, নাকি কোন গভীর ভালোবাসার কারণে বলেছিলেন যে, 'আশহাদু' থেকে 'আসহাদু' আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এ কথায় বেলাল (রা.) কী বুঝেছিলেন? বেলাল (রা.) এ বাক্যের এ অর্থ করেছিলেন যে, যদিও আমি ভিন জাতির এবং এমন জাতির মানুষ যাদেরকে মানবতার গণ্ডি বহির্ভূত মনে করা হয় আর দাস বানানো হয়, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসা ও প্রীতি বিদ্যমান। বেলাল (রা.) এটি বুঝেছিলেন যে, ভিন জাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আর এমন জাতির লোক হওয়া সত্ত্বেও যাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, আমাকে তিনি (সা.) ভালোবেসেছেন এবং স্নেহ করেছেন। আমরা এ ঘটনার কিছুকাল পূর্বে গিয়ে দেখি, এই একই ব্যক্তি যিনি বলেন, مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সূরা আল্ আনআম: ১৬৩)। মহানবী (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সূরা আল্ আনআম: ১৬৩) অর্থাৎ আমার মৃত্যুও আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন, নতুন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, নতুন লোক সামনে আসে এবং নুতন পরিবর্তন সাধিত হয়।

সময় অতিবাহিত হয়েছে, নতুন রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। কতিপয় সাহাবী আরব থেকে শত শত মাইল দূরে চলে যান। সেসব সাহাবীদের মাঝে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ সব পরিবর্তন ঘটলে তিনি (রা.) সিরিয়ায় চলে যান এবং দামেস্কে গিয়ে পৌঁছেন। একদিন দামেস্কে কিছু মানুষ একত্রিত হয়, সেখানে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন, আর তারা বলে, রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে বেলাল (রা.) আযান দিতেন। আমরা চাই, বেলাল (রা.) যেন পুনরায় আযান দেন। তারা বেলাল (রা.)-কে অনুরোধ করে, কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) অস্বীকার করে বলেন, আমি এখন আযান দিতে পারব না। বেলাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর আমি আর আযান দিব না। কেননা যখনই আমি আযান দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করি তখনই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বরকতময় যুগ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই, এজন্য আমি আযান দিতে পারব না। বিষয়টি আমার সহ্যসীমার বাহিরে চলে যায়। হযরত উমর (রা.)ও তখন দামেস্ক-এ এসেছিলেন, ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে সফরে ছিলেন। মানুষজন তাঁর অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিবেদন করে যে, আপনি বেলালকে আযান দিতে বলুন। আমাদের মাঝে এমন লোকেরাও রয়েছে যারা মহানবী (সা.)-কে দেখেছে আর বেলালের আযান শোনার জন্য আমাদের কান ছটফট করছে। সেই যুগ অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর যুগ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, হযরত বেলালের আযান আমাদের কল্পনার জগতে ভেসে উঠে। আমরা বাস্তবেও একবার হযরত বেলালের আযান শুনতে চাই, যেন সেই যুগ আমাদের চোখের সামনে আরো ভালোভাবে ফুটে উঠে। আর আমাদের মাঝে তারাও রয়েছে, যারা মহানবী (সা.)-এর যুগ পায় নি, তাদের হৃদয়ের বাসনা হল, সেই ব্যক্তির আযান শোনা, যার আযান মহানবী (সা.) শুনতেন এবং তিনি তা পছন্দও করতেন। হযরত উমর (রা.) বেলালকে ডাকেন এবং বলেন, মানুষ আপনার আযান শুনতে চায়। তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আপনি যুগ খলীফা। আপনি চাইলে আমি আযান দিচ্ছি, কিন্তু আমি এটিও বলে রাখছি যে, আমার মাঝে তা সহ্য করার শক্তি নেই। অতএব হযরত বেলাল দাঁড়িয়ে যান এবং সুউচ্চকণ্ঠে ঠিক সেভাবে আযান দেন যেভাবে তিনি মহানবী (সা.)-এর যুগে আযান দিতেন। আযান শুনে মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা স্মরণ করে তাঁর আরব সাহাবীগণের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে আর কেউ কেউ চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। হযরত বেলাল আযান দিতে থাকেন আর শ্রোতাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর যুগের স্মরণে আবেগ ভিড় করতে থাকে। কিন্তু হযরত বেলাল, যিনি হাবশী ছিলেন, যার কাছ থেকে আরবরা সেবা গ্রহণ করেছে, আরবদের সাথে যার কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না, আর ভ্রাতৃত্ববন্ধনেরও সম্পর্ক ছিল না, আমাদের দেখতে হবে যে, স্বয়ং তার হৃদয়ে কী প্রভাব পড়েছে। উক্ত প্রভাব ছিল সেসব আরবদের ওপর প্রভাব, যারা মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক ছিল। তাদের সেই যুগের কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর যারা সেই যুগের আরব ছিল না, তাদের সেসব কথা স্মরণ হয়ে যায় ও তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে যায়, অথবা একে অপরকে দেখে তারা আবেগ আপ্লুত হন। কিন্তু হযরত বেলাল, যিনি আরবও ছিলেন না, উপরন্তু ক্রীতদাস ছিলেন, তাঁর ওপর এই আযানের কী প্রভাব পড়েছে (সেটি হল দেখার বিষয়)। বলা হয়, তিনি (রা.) অর্থাৎ হযরত বেলাল আযান শেষ করার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েন–এই প্রভাব পড়েছে তাঁর ওপর, আর কয়েক মিনিট পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এটি বিজাতিদের সাক্ষ্য ছিল মহানবী (সা.)-এর এই দাবির সত্যায়নে যে, আমার কাছে আরব এবং অনারবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি হল সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। এই প্রেম ও ভালোবাসা, যা অনারব জাতিগুলো তাঁর (সা.) প্রতি প্রদর্শন করেছে। মহানবী (সা.) যে বলেছেন, আরব এবং অনারবদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এটি হল তার সত্য ও ব্যবহারিক সাক্ষ্য, এটি হল তার বহিঃপ্রকাশ। এটি ছিল বিজাতিদের সাক্ষ্য, যারা তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ ডাক শুনেছে এবং এর যে প্রভাব তারা প্রত্যক্ষ করেছে, সেটি তাদের মাঝে এ বিশ্বাস সঞ্চার করেছে যে, তাদের নিজেদের জাতিও তাদেরকে সেভাবে ভালোবাসতে পারে না যেরূপভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে ভালোবাসতেন। ইনি ছিলেন আমাদের সৈয়্যদনা বেলাল, যিনি নিজের মনিব ও অনুসরণীয় নেতার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার আর আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদকে নিজ হৃদয়ে গ্রথিত করা এবং তার ব্যবহারিক প্রকাশের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং পবিত্র আদর্শ। এছাড়া নিজের এই সেবকের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও স্নেহের উপাখ্যানও পৃথিবীর আর কোথাও আমরা দেখতে পাই না। এটিই সেই বিষয় যা আজও প্রেম ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে পারে। সুতরাং আজও তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং রসূলে আরব (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার উক্ত মানে উপনীত হওয়াতেই আমাদের মুক্তি নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। হযরত বেলালের স্মৃতিচারণ আজ এখানে শেষ হচ্ছে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের (গায়েবানা) জানাযা পড়াব। তাদের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হল, মোহতরম তৈয়ব ইয়াকূব সাহেবের পুত্র ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো-র মুবাল্লেগ মওলানা তালেব ইয়াকূব সাহেবের। তিনি গত ৮ সেপ্টেম্বর তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ শৈশব থেকেই তিনি

ধর্মানুরাগী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ত্রিনিদাদের অধিবাসী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পাঁচ বেলার নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী বইপুস্তক অধ্যয়নে তার প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ব্রিটিশ ইন্সুরেন্স-এ চাকরি পান। কিন্তু 'ও' লেভেল করার পর ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৯ সনে তিনি জীবন ওয়াক্‌ফ করেন এবং জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮৯ সনে তিনি শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। তার বিবাহ হয় ১৯৮৭ সনে কাদিয়ানের সাবেক দরবেশ, নায়েব নাযেরে আ'লা মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের কন্যা মোকর্‌রমা সাজেদা শাহীন সাহেবার সাথে। তার স্ত্রী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ভাই মির্যা বরকত আলী সাহেবের পৌত্রী। জামেয়া পাশ করার পর তার প্রথম নিযুক্তি বা পদায়ন হয় আফ্রিকার জায়েরে। সেখানে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর তিনি সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত গায়ানা জামা'তে মুবাল্লেগ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পান। অতঃপর সেখান থেকে তাকে ঘানার দুটো ভিন্ন অঞ্চল কোপেরেডুয়া ও কুমাসিতে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সন পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করার সৌভাগ্য পান। সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হবার পর তাকে ত্রিনিদাদে নিয়োগ দেয়া হয়, যেখানে ফ্রীপোর্ট জামা'তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে একান্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের কাছে তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। যেখানেই গিয়েছেন জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। জামা'তের সদস্যরা তার সাথে বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক রাখত আর তিনিও তাদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। বিগত কয়েক বছর থেকে তিনি কিডনি বা বৃক্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। ডায়ালিসিসের জন্য সপ্তাহে তিনবার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যেতে হতো, তথাপি জামা'তের কার্যক্রমে তিনি কোন বাধা আসতে দেন নি। অত্যন্ত মুত্তাকী, বিনয়ী, নরম প্রকৃতির, নম্রভাষী, ধৈর্যশীল ও অনুগত ছিলেন। সহনশীল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে সর্বদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত, রাতে শোয়ার পূর্বে আট রাকাত নফল আদায় করা তার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিল। জামা'তী রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। নিজ পরিবারকেও এসব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করতেন। নিজের পরিবারে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার স্ত্রী ছাড়াও একজন পুত্র নাসের ইয়াকূব এবং দুই কন্যা আমিনা ইয়াকূব ও আদিলা ইয়াকূব রয়েছে। তার দুই ভাই এবং তিন বোন রয়েছে। তাদের কয়েকজন ত্রিনিদাদে রয়েছে এবং কয়েকজন অস্ট্রেলিয়াতে রয়েছে। তার একজন ভাবি হেলেন ইয়াকূব সাহেবা বলেন, আমি ত্রিশ বছর পূর্বে বয়আত গ্রহণ করেছি। মওলানা সাহেব ত্রিনিদাদে আসলে সর্বদা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ধর্মের নতুন নতুন কথা আমাকে শেখাতেন। এর কারণে আমার ধর্ম শেখার আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। তালেব ইয়াকূব সাহেবের এমন আচরণের কারণেই আমার পুত্র তৈয়্যব ইয়াকূব আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুরব্বী হবার নিয়্যত করেছে এবং এখন জামেয়া আহমদীয়া কানাডার দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা গ্রহণ করছে। যেখানে তার চিকিৎসা চলছিল সেখানে একজন আহমদী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক ডাক্তার ও নার্স, যারা তার চিকিৎসা করেছে, তার নৈতিক গুণাবলীতে খুবই প্রভাবিত ছিল। তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন, তার বসা অবস্থায় কেউ এসে গেলে এবং হাসপাতালে আসন সংকট থাকলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে গিয়ে অন্যদের বসার সুযোগ করে দিতেন। রোগীদের জন্যও এবং ডাক্তারদের জন্যও এক অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। অন্য মানুষজনের জন্যও এক অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, একজন মুরব্বী ও মুবাল্লেগের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে সত্যিকার অর্থে গুণান্বিত ছিলেন। খিলাফতের আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা অগ্রসর-অগ্রগামী ছিলেন; তার ঊর্ধ্বতনদের প্রতিটি কথা মান্য করতেন এবং যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, সেটিকে যথার্থরূপে পালনের পূর্ণ চেষ্টা করতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। কুরআন করীম তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত ছিলেন।

ত্রিনিদাদের একজন মুরব্বী কাসেদ উরায়েচ সাহেব বলেন, ত্রিনিদাদে যখন আমার পোস্টিং হয় তখন মওলানা সাহেব শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন, আবার বয়সেও তিনি বড়; এই মুরব্বী সাহেব যুবক, দু'তিন বছর হল কানাডা জামেয়া থেকে পাস করে সেখানে গিয়েছেন। তিনি বলেন, মাত্র কয়েকদিনের মাথায় মওলানা সাহেব পঞ্চাশ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রসহ আমার সাথে দেখা করতে আসেন এবং অত্যন্ত স্নেহসুলভ ব্যবহার করেন। এরপর দু'তিন দিন পর পর ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়ে বা ফোন করে আমার কুশলাদি জেনে নিতেন যে, নতুন নতুন এসেছ, তোমার অনেককিছু দরকার হতে পারে। সেইসাথে হয়ত তাকে বিভিন্ন উপদেশও দিতেন এবং বোঝাতেনও। ছোট-বড় সবার সাথে ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সবসময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন এবং যুগ-খলীফার জন্য দোয়া

করার নসীহত করতেন। তার মেয়ে লিখেন, আমাকে সবসময় বলতেন যে, পরীক্ষার পূর্বেও এবং সর্বদা সব কাজের জন্য যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য লিখবে। স্থানীয় একজন আহমদী মুনীর ইব্রাহীম সাহেব বলেন, আমরা যখনই তবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও যেতাম, সবসময়ই মওলানা সাহেব উপস্থিত থাকতেন এবং তবলীগের দায়িত্ব বণ্টন করে নিতেন; কাউকে বলতেন, তুমি উত্তরে যাও, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, যেন অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে। তিনি সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তার সহকর্মী যুবক মুরব্বীরা এবং অন্যরাও একই কথা বলেছেন যে, জামা'তের উন্নতির জন্য এবং তবলীগের জন্য কেউ যদি সামান্য কোন কাজও করত, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং তাকে অনেক উৎসাহ দিতেন। একথা প্রত্যেকেই লিখেছেন যে, তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং মিমাংসাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মাঝে কোন মনোমালিন্য দেখা দিলে, সবসময় মিমাংসা করিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আমরা আহমদীই! আর কোন ভাইয়ের প্রতি মনে ক্ষোভ রাখা উচিত নয়। আমিও তাকে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি। খিলাফতের প্রতিও অগাধ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল; আর যেমনটি আমি বলেছি, তার সন্তানরাও এটিই বলেছে যে, আমাদেরও এ কথাই বলতেন যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাক এবং নিয়মিত চিঠি লিখতে থাক।

একজন নতুন বয়আতকারী নারেশ সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন অ-আহমদী মসজিদে গিয়ে প্রকৃত ইসলামের সন্ধান করতাম। যখন আমি মওলানা তালেব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন কোন যুক্তি-প্রমাণ শোনার পূর্বেই আমার মনমস্তিষ্কে খুব ভালো একটি প্রভাব সৃষ্টি হতে থাকে। সে কারণেই তিনি এরপর বয়আত গ্রহণ করেন। যাহোক, তালেব ইয়াকূব সাহেব ওয়াক্‌ফের দায়িত্বও পূর্ণ নিষ্ঠা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পালন করেছেন এবং কখনো কোন অজুহাত দেখান নি। এটি-ই বলতেন যে, যুগ-খলীফা যেখানেই নিযুক্ত করবেন সেখানেই কাজ করতে হবে; আর তিনি যদি কখনো আমাকে বলেন যে, তুমি পাকিস্তানে থাক, পাকিস্তানেই তোমার পোস্টিং, নিজের দেশে ফিরে যেও না, তাহলে আমি সেটির জন্যও প্রস্তুত আছি। কার্যত এর প্রস্তুতিস্বরূপ পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি পাঞ্জাবী ভাষা শেখারও চেষ্টা করেন যে, যদি সেখানে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে পাঞ্জাবের লোকদের সাথে কাজ করতে হতে পারে; এজন্য তিনি পাঞ্জাবী ভাষা শিখতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষা করুন এবং তাদেরকে মরহুমের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা মুকাররম ইঞ্জিনিয়ার ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেবের যিনি সাবেক ওকিলুল মাল সালেস আর মজলিসে তাহরীকে জাদীদের নায়েব সদরও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বেশ দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। গত ৩ জুন তারিখে তিনি ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ইফতেখার আলী সাহেবের পিতার নাম মমতাজ আলী কুরায়শী সাহেব। পেশাগতভাবে তিনি পশু চিকিৎসক ছিলেন। ইফতেখার আলী সাহেব ভারতের মিরঠে জন্ম গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মিরঠেই অর্জন করেন। এরপর রোড়কির থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ভর্তি হন, যা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে, এবং ১৯৪৪ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবনেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁর পিতা তখন আহমদী ছিলেন না। কিন্তু ইফতেখার কুরায়শী সাহেব স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে গবেষণা শেষে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব ও তার পিতা মুন্সী ফাইয়ায আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী পেয়েছিলেন। ইফতেখার কুরায়শী সাহেব অধিকাংশ সময় পড়ালেখার প্রয়োজনে নিজ বড় চাচা তুরাব আলী সাহেবের কাছে থাকতেন। তুরাব আলী সাহেবও আহমদী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব নিজ পিতার সাথে অধিকাংশ সময় উপশহর মিরঠের সারাবাহতে ইফতেখার আলী সাহেবের বড় চাচার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। কুরায়শী ইফতেখার আলী সাহেব ঐ সকল পুণ্যাত্মাদের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বইপুস্তক পেতেন আর দিল্লী জামা'তও ছোট ছোট লিফলেট প্রচার করত। ঐ সকল লিফলেটও ইফতেখার আলী সাহেব অধ্যয়নের জন্য পেতেন। ইফতেখার আলী সাহেব সফরে সেসব বইপুস্তক পড়ে ফেলতেন এবং নিয়ে নিজ পিতার হাতে তুলে দিতেন। ইফতেখার সাহেব যখন থমসন কলেজে ভর্তি হন তখন তার ফুপা মুখতার কুরায়শী সাহেব তাকে নিয়মিত পত্রযোগে ব্যাপক পরিসরে তবলীগ আরম্ভ করেন। ইফতেখার আলী সাহেবও বিস্তারিতভাবে সেসবের উত্তর দিতেন। সে যুগেও তার তাহাজ্জুদ আদায়ের এবং প্রাণঢালা দোয়া করার সুযোগ লাভ হয়, কিন্তু হৃদয়ে এক অস্থিরতা এবং ভীতি ছিল। একবার তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে হৃদয়ের এ অবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে হুযূর (রা.) লিখেন, আপনার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ, তাই এর উত্তর পত্রের মাধ্যমে দেয়া দুরূহ। আপনি আমার অমুক পুস্তকটি পাঠ করে নিন। ইফতেখার আলী সাহেব উক্ত পুস্তক তার ফুপা মুখতার সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে পড়া শুরু করেন। তিনি যতই তা পাঠ করতে থাকেন

ততই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে পত্রের মাধ্যমে তিনি লিখিত বয়আত করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কাদিয়ানের জলসায় আসেন আর কাদিয়ানের পরিবেশ দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বক্তৃতাগুলো তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং সেখানেও তিনি বয়আত করেন। এভাবে তিনি খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আতের সৌভাগ্যও লাভ করেন। প্রত্যেক বছর তিনি কাদিয়ানের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী'র সাথেও তিনি সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন। মাথায় কোন প্রশ্ন থাকলে তিনি তা হুযূরের কাছে উপস্থাপন করে উত্তর জেনে ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে ফিরে যেতেন।

ভারতেই তিনি সরকারী চাকরি শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই চাকরি করেন। ১৯৫১ সালে হিযরত করেন। পাকিস্তানে সেচ ও এনার্জি বিভাগে চাকুরি করেন। সরকারী চাকরির সুবাদে বিভিন্ন শহরে তার বদলি হয়। তিনি খুবই সততার সাথে কাজ করেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে পদোন্নতির ধারায় তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হন, বরং একবার কিছুকালের জন্য তাকে পাঞ্জাব সরকারের সেচ ও এনার্জি মন্ত্রনালয়ের সচিব পদেও অধিষ্ঠিত করা হয়, অর্থাৎ তিনি সচিব পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। খুবই সম্মান ও দক্ষতার সাথে নিজ দেশ পাকিস্তানের সেবা করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন, কিন্তু এর পূর্বে ১৯৮০ সালে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্পেন সফর শেষে রাবওয়ায় ফিরে গিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদীয়া আর্কিটেক্টস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস' প্রতিষ্ঠা করেন তখন ইফতেখার আলী কুরায়শী সাহেবকে এর প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। সেই সময় তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন এবং পরে অবসরে যান। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করার জন্য আবেদন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার ওয়াক্‌ফ মঞ্জুর করেন আর ১৯৮৩ সালে তার ওপর তাহরীকে জাদীদের ওকিলুল মাল সালেসের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। প্রথমে তাকে মনোনয়ন দেয়া হয় কিন্তু এরপর তিনি এ পদে যথারীতি নির্বাচিত হতে থাকেন। তিনি ১৯৮০ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সময়েও তার বহু কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। যেমন বুয়ুতুল হাম্‌দ কোয়াটার নির্মাণ ছাড়াও রাবওয়ায় জামা'তী বিল্ডিং নির্মাণের তিনি সুযোগ পেয়েছেন। তিনি নির্মাণ কমিটির তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। এছাড়াও তাকে অন্যান্য প্রজেক্টের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়, যেমন– ফযলে ওমর হাসপাতাল, জামেয়া আহমদীয়া, খিলাফত লাইব্রেরী ইত্যাদি। একই সাথে তিনি ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে কাজ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ২০০৭ সালে আমি তাকে মজলিস তাহরীকে জাদীদের নায়েব সদর নিযুক্ত করেছিলাম। তিনি খুবই বিশ্বস্ততা, একাগ্রতা ও ভালোবাসার সাথে কাজ করতেন। চারজন খলীফার যুগ তিনি দেখেছেন এবং সর্বদা সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য ও ভালোবাসা প্রদর্শনকারী প্রমাণিত হয়েছেন। স্বল্পভাষী ছিলেন আর সর্বদা নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী হিসাবে তিনি সাঁইত্রিশ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে তিনি কাজ করতেন, আমিও তার সাথে কাজ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুই পুত্র ও তিন কন্যা দান করেছেন। তার এক পুত্র স্থপতি এবং এক কন্যা মহিলা ডাক্তার। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার ব্যবহার করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমুহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তৃতীয় জানাযা রাজিয়া সুলতানা সাহেবার, যিনি মৌলভী হাকিম খুরশিদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী শায়খুল্লাহ্ বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন। যৌবনেই নামায-রোযায় কঠোরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন। সারাজীবন সরলতা ও বিনয়ের সাথে অতিবাহিত করেছেন। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তারা স্বামী হাকিম মৌলভী খুরশিদ আহমদ সাহেব সদর উমুমীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এ সময় তার বাসায় মিটিং, সভা প্রভৃতি হতো আর তিনি অতিথিদের আতিথ্য করতেন। মুকাররম মৌলভী সাহেবের ১৯৮৪ সালে আড়াই বছর আসীরে রাহে মওলা (আল্লাহ্‌র পথে বন্দি) থাকার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। এ সময়টি তিনি নিজ স্বামীর অবর্তমানে পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। কেবলমাত্র তা-ই নয় বরং দৈনিক বেশ কয়েকজনের খাবার প্রস্তুত করে জেলে পাঠাতেন এবং অতি গোপনে পুণ্যকাজ করতেন। বেশ কয়েকজন গরীব ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন, কয়েকজন গরীব শিশুকে লালনপালন করেছেন। আপনপর সবাই এ কথা বলেছে যে, খুবই স্নেহশীলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তিনি এক কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা কাদিয়ানের নায়েব নাযের বায়তুল মাল মুহাম্মদ মনসুর আহমদ সাহবের পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ তাহের আহমদ সাহেবের। ২৮ মে তারিখে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৫৭ বছর বয়সে কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মরহুম হায়দারাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান থেকে পাশ করার পর ১৯৮৯-২০২০ পর্যন্ত মোট ৩১

বছর জামা'তের বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। পুরোটা সময় জুড়ে তিনি অর্থ দপ্তরে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বায়তুল মাল আমদ দপ্তরে ৭ বছর, নেযামত মাল ওয়াকফে জাদীদ-এ ৯ বছর, ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল ও নায়েব নাযের মাল ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে ৩ বছর, নাযেম মাল ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে ৮ বছর এবং নায়েব নাযের বায়তুল মাল হিসেবে ২ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সরলমনা, মিশুক ও সহানুভূতিশীল একজন কর্মী ছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে সফর করেছেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জামা'তের সদস্যদের অবগত করেছেন এবং তাদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার এসব সফর ও চেষ্টাপ্রচেষ্টার ফলে ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেটও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা ছাড়াও তার স্ত্রী এবং দুই পুত্র রয়েছে। মরহুম কাদিয়ানের কাযা বোর্ডের প্রধান মওলানা মুহাম্মদ করীম শাহেদ সাহেবের বড় জামাতা এবং কাদিয়ানের নাযেরে আ'লা ইনআম গৌরী সাহেবের মামাতো ভাই ছিলেন। মরহুমের এক ভাই কাদিয়ানে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকে সুরক্ষিত রাখুন।

পরবর্তী জানাযা হল স্নেহের আকীল আহমদ-এর, যে-কিনা ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়া ঘানার শিক্ষক মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেবের পুত্র। আকীল আহমদ পাকিস্তানে গিয়েছিল আর সেখানে গিয়ে তার yolk sac tumor ধরা পড়ে। স্বল্পকালের অসুস্থতার পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে ঐশী তকদীরের অধীনে সে মৃত্যুবরণ করে, اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

ছোটকাল থেকেই সে বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত ছিল। নিজের চেয়ে কমবয়সী শিশুদের প্রতি যত্নবান, অত্যন্ত নেক এবং অনুগত ছিল। ঘানার মাদরাসাতুল হিফযে ৬ পারা হিফয করারও সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল তার। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়া ২ বোন স্নেহের আদীলা ও শাকীলা রয়েছে। তারা দু'জনই ওয়াকেফাতে নও। তার পিতা মির্যা খলীল আহমদ বেগ সাহেব ঘানার ইন্টারন্যাশনাল জামেয়া আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছেন। জামেয়া আহমদীয়া ঘানার আরেকজন শিক্ষক নাসির আহমদ সাহেব লিখেন, আকীল আহমদ অত্যন্ত স্নেহের ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল। তার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমার সবসময় মনে থাকবে। সে এক নিষ্পাপ ও অনুগত ছেলে ছিল। বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ছিল। রুটিনের পড়াশোনা ছাড়া সে গত বছর থেকে পবিত্র কুরআন হিফয করছিল। প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর খাবার খেয়ে মসজিদে গিয়ে নিজের পাঠ রিভাইজ করত এবং স্কুলের কাজ শেষ করে প্রত্যহ পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত করার পর ঘুমাতে যেত। সে বলতো, আমি বড় হয়ে মুরব্বী হয়ে জামা'তের কাজ করব। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পিতামাতা ও বোনদের এই শোক সহ্য করার সামর্থ্য দান করুন।

বর্তমানে এখানে হাযের জানাযা আসে না। অনেকেই আমার নিকট গায়েবানা জানাযা পড়ানোর আবেদন করে থাকেন। তাদের সবার জানাযা জুমুআর দিন পড়ানো সম্ভব হয় না, কেননা এর জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। কেবল নাম পড়তে গেলেই অনেক সময় লেগে যায়। তাই মোটের ওপর আমি এখানে গুটিকতক ব্যক্তির জানাযা পড়িয়ে থাকি। যদিও আরো অনেকের আবেদন এসে থাকে। আমি তাদের সকলের নাম না নিয়েই বলে দিচ্ছি, যাদের জানাযা আমি এখানে পড়াই তাদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। যারা জানাযা পড়ানোর আবেদন করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তরসূরীদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তাদের পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। যাহোক, জুমুআর নামাযের পর আমি এই সমস্ত (মরহুমের) গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার,

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সংর্ধনায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ভাষণ

২৩ নভেম্বর, ২০১৫ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় ইমাম, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) টোকিওর ওদাইবাস্থ হিল্টন হোটেলে, তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিশেষ সংর্ধনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন। এ সংর্ধনা অনুষ্ঠানে ৬০ এর অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত হুযূর ৭০ বছর পূর্বে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে সংঘটিত নিউক্লিয়ার বোমা হামলার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেন। এই সান্ধ্য অধিবেশনে তাঁর পূর্বে দু'জন অতিথি বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন তোকিবো গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান ড. মাইক সাতা ইয়াসুহিকো এবং ২০১১ সালের ভূমিকম্প ও সুনামিতে সবচেয়ে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তোহোকু অঞ্চল থেকে আগত মি. এন্দো শিনিচি।

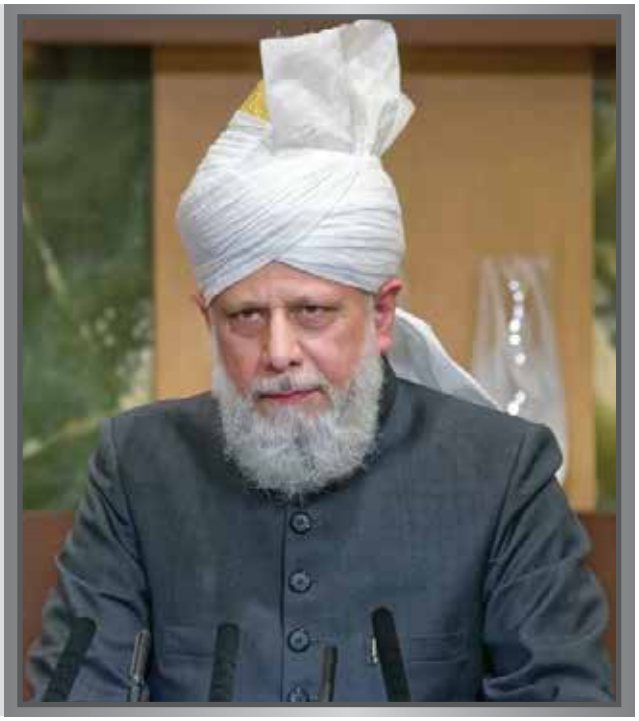

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

এ সুযোগে সর্বপ্রথম আমি অতিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত নাজুক ও বিপদসংকুল সময় অতিবাহিত করছি যখন চলমান বিশ্বপরিস্থিতি আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ। সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা পৃথিবীকে গ্রাস করছে আর বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আজ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

আজ যদি আমরা মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকাই, তবে দেখবো, অনেক দেশের সরকারই তাদের নিজ জনগণের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। রক্তপাত ও অর্থহীন সহিংসতা সেই দেশগুলোর ভিতে কুঠারাঘাত করছে, আর এর ফলে সৃষ্ট নেতৃত্ব-শূন্যতাগুলোর সুযোগ নিচ্ছে চরমপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠী, যারা কোন কোন এলাকার নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করে নিজেদের তথাকথিত সরকার ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে। তারা চরম ঘৃণ্য আচরণ করছে, আর সবচেয়ে বর্বরতম নৃশংসতা চালাচ্ছে। কেবল নিজ দেশেই নয় বরং এখন তারা ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর এ সহিংসতার সর্বশেষ উদাহরণ হল প্যারিস-হামলা।

পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া ও ইউক্রেনের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে ঘিরে সংঘাত ও শত্রুতার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বারবার জ্বলে উঠছে। তদুপরি, সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ চীন-সাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের অনুপ্রবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে

সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি আপনারা সম্যক অবহিত আছেন, চীন ও জাপানের মধ্যে কয়েকটি বিতর্কিত দ্বীপ নিয়ে দীর্ঘদিন আঞ্চলিক বিরোধ চলে আসছে।

অনুরূপভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ অনেকটা স্থায়ী রূপ নিয়েছে যা প্রশমনের কোন লক্ষণ নেই। একইভাবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যেকার উত্তেজনা উক্ত অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করেছে।

আফ্রিকাতে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী কতক এলাকায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে আর ব্যাপক সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব যেসব সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে আমি তার মধ্য হতে মাত্র কয়েকটির এখানে উল্লেখ করলাম কিন্তু নিশ্চিতভাবে সংঘর্ষ ও অস্থিরতার এমনি আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

অতএব, একমাত্র সিদ্ধান্ত যাতে পৌঁছানো সম্ভব তা হল, বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা বিশ্বকে গ্রাস করছে। বর্তমান সময়ের যুদ্ধের ক্ষেত্র পূর্ববর্তী যুগসমূহের সাথে তুলনার নিরিখে অনেক বিস্তৃত এবং ব্যাপক। বিশ্বের এক প্রান্তে সংঘাত দেখা দিলে আজ তা আর সেখানে বা সে অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর প্রভাব ও জের বহু দূর গড়ায়।

গণমাধ্যম ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পৃথিবীকে একটি বিশ্বপল্লীতে পরিণত করেছে। কোন যুদ্ধ কেবল সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে– এটি শুধু পূর্বে সম্ভব ছিল; কিন্তু এখন প্রতিটি যুদ্ধ বা সংঘাতের প্রভাব আক্ষরিকভাবেই বিশ্বজনীন। বিশ্ববাসীর অনুধাবন করা উচিত, এক অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হলে তা বিশ্বের অন্যান্য অংশের শান্তি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করতে পারে এবং করবে– বস্তুতঃপক্ষে, আমি অনেক দিন ধরেই এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছি।

যদি আমরা পিছন ফিরে ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, বিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান ছিল তার আজকের আধুনিক ও ধ্বংসাত্মক সমরাস্ত্রের এবং হাতিয়ারের সাথে কোন তুলনাই চলে না। তথাপি, বলা হয়, কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই প্রায় ৭ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল আর নিহতদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল নিরীহ বেসামরিক মানুষ। তাই আজ সম্ভাব্য বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যে পারমাণবিক মারণাস্ত্র ছিল সেগুলো যদিও অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ছিল, কিন্তু ভয়াবহতার দিক থেকে আধুনিক যুগের পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ধারে কাছেও সেগুলো ছিল না। তদুপরি এখন যে কেবল পরাশক্তিগুলোর হাতেই পারমাণবিক বোমা রয়েছে তাই নয় বরং কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশও আজ এর অধিকারী।

যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে বৃহৎ শক্তিগুলো প্রতিরোধক হিসেবে এমন মারণাস্ত্র রেখে থাকে কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, ছোট দেশগুলো সেই সংযম প্রদর্শন করবে। তারা কখনো নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করবে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে, আপনাদের জাতিকে ভয়াবহতম ধ্বংসযজ্ঞ ও অকল্পনীয় শোকের সম্মুখীন হতে হয়েছে যখন মানবজাতির জন্য কলংকজনক এক নিউক্লিয়ার হামলায় আপনাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিককে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল আর আপনাদের দু'টো শহরকে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

এ মর্মান্তিক বিপর্যয়ের সাক্ষী ও ভুক্তভোগী হওয়ার পর জাপানের মানুষ কখনো চাইবেনা যে, জাপানে বা বিশ্বের অন্য কোন প্রান্তে এরূপ হামলার পুনরাবৃত্তি হোক। আপনারাই একমাত্র জাতি যারা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি রাখেন।

আপনারা সেই জাতি যারা জানেন যে, এমন অস্ত্র ব্যবহারের ফলাফল ও জের কেবল এক প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাঝে তা চলতে থাকে। আপনারা সেই জাতি যারা নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের অভূতপূর্ব কুফল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারেন। অতএব শান্তি ও নিরাপত্তার মূল্য জাপানী জাতির চেয়ে বেশি কে আর বুঝবে?

আনন্দের বিষয় হল, জাপান সে অবস্থার উত্তরণে সফল হয়েছে আর আজ একটি অত্যন্ত উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে, তাই আপনাদের অতীত ইতিহাসকে দৃষ্টিপটে রেখে জাপানকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে হবে।

পরিতাপের বিষয় হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ আরোপ করা হয়েছে যাতে জাপানের পক্ষে বৃহত্তর পরিসরে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় কোন ভূমিকা রাখা দুস্কর হয়ে পড়ে।

তথাপি বৈশ্বিক বিষয়াদি ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আপনাদের দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাই আপনাদের উচিত হবে আপনাদের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মাঝে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হওয়া।

ইতিহাসের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর এটি হল ৭০তম বর্ষপূর্তি, যখন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা হামলা করে আপনাদের জাতিকে ভয়াবহ ধ্বংস, বিপর্যয় ও ভোগান্তির সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

আপনাদের জাদুঘর নির্মাণের সুবাদে যা সেই বিভীষিকা ও রক্তপাতের সঠিক চিত্র তুলে ধরে অধিকন্তু পারমাণবিক বোমার কিছু জের আজও বিদ্যমান থাকার কারণে জাপানীরা আজও উপলব্ধি করে, যুদ্ধ ও সংঘাত কত ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

যেমনটি একটু আগেই বলেছি, যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি আপনারা হয়েছিলেন তা যুদ্ধোত্তর জাপানের ওপর নিষ্ঠুর ও একেবারেই অপ্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞাসমূহ

আরোপের কারণে কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দশকের পর দশক পার হলেও নিষেধাজ্ঞাগুলো যুদ্ধের ভয়ানক পরিণতির কথাই বারবার স্মরণ করাতে থাকবে।

যখন জাপানের বিরুদ্ধে পারমানবিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৎকালীন প্রধান, জামাতের দ্বিতীয় খলীফা, তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন:

আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার আমাদের কাছে দাবী হল পুরো বিশ্বের সামনে এই ঘোষণা করা যে "আমরা কোন অবস্থাতেই এ বিভীষিকাময় আক্রমণ ও রক্তপাতকে ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। আমি যা বলছি তা কোন সরকার যদি পছন্দ না করেন এতে আমার কিছু আসে যায় না।"

দ্বিতীয় খলীফা আরো বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হবে বলে আমি মনে করি না; বরং তাঁর দূরদৃষ্টি অনুসারে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও সংঘাতের অশুভ ছায়া আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে।

আজ তাঁর সতর্কবাণী পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যদিও একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় নি, কিন্তু বাস্তবে বিশ্ব যুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। বিশ্ব জুড়ে নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা, অত্যাচার ও মার্মান্তিক নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে।

আমাদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সরব, তা বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই সংঘটিত হোক না কেন। কেননা ইসলামী শিক্ষার দাবি হল, আমরা যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই এবং তাদের পাশে দাঁড়াই যাদের সাহায্যের প্রয়োজন অথবা যারা নির্যাতিত। আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম কীভাবে জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করে আওয়াজ উঠিয়েছেন।

এছাড়া একজন বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত আহমদী মুসলমান, বিশ্ব-দরবারে যার একটি বিশেষ মর্যাদা ও প্রভাব ছিল, জাপান ও এর জনগণের পক্ষে কথা বলাকে নিজ দায়িত্ব বলে গণ্য করেছেন। আমি স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান-এর কথা বলছি যিনি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদও অলংকৃত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপনান্তে তিনি কতিপয় শক্তির জাপানের ওপর অন্যায্য অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের অপ-প্রয়াসের বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করেন এবং এর নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

১৯৫১ সালের সান ফ্রাঁনসিসকো শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে ভাষণ দানকালে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান বলেন:

"জাপানের সাথে শান্তির ভিত রচিত হওয়া উচিত সুবিচার ও সমঝোতার ওপর, প্রতিশোধ ও নিপীড়নের ওপর নয়। জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সংস্কারের যে ধারা সূচিত হয়েছে এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ভবিষ্যতে জাপান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, আর এর মাঝে উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত আছে যা জাপানকে বন্ধুভাবাপন্ন শান্তিকামী দেশসমূহের মাঝে সমমর্যাদার আসনে বসার সম্মান দেবে।"

তাঁর ভাষণের ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন ও ইসলামের মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, কোন যুদ্ধের বিজয়ী পক্ষের অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া উচিত নয় আর পরাজিত পক্ষের ওপর অপ্রয়োজনীয় অবরোধ আরোপ করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করাও উচিত নয়।

চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের জাপানের পক্ষ নিয়ে এ ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রদানের কারণ হল, একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে তিনি কেবল পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বই করছিলেন না বরং সর্বাগ্রে তিনি ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

আর তাই যেমনটি আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, আপনারা সেই জাতি যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নৃশংসতার পরিণাম সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভাল উপলব্ধি রাখেন। তাই, সব স্তরে সম্ভাব্য সকল উপায়ে জাপান সরকারের উচিত সর্বপ্রকার অমানবিকতা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও এর প্রতিকার করা। তাদের চেষ্টা করা উচিত, যে বিভৎস হামলার তারা শিকার হয়েছিলেন, বিশ্বের কোথাও ভবিষ্যতে কোনদিন যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

যেখানেই যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, জাপানের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের উচিত হবে উত্তেজনা প্রশমনে ও শান্তি স্থাপনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করা। ইসলামের যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, কিছু মানুষ একে একটি বর্বর ও সহিংস ধর্ম বলে মনে করে। মুসলিম বিশ্বের সন্ত্রাস ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে তারা তাদের দাবির সপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে।

কিন্তু, তাদের বিশ্বাস একেবারেই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের শান্তির শিক্ষার কোন তুলনা নেই। এ জন্যই আমাদের জামাতের দ্বিতীয় খলীফা এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান আপনাদের জাতির বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি উত্থাপন করেছেন। সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা কী, অতি সংক্ষেপে আমি এখন তার ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করবো।

একটি মৌলিক নীতি হিসেবে, ইসলাম বলে, কোন যুদ্ধ যা ভূ-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় বা প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য পরিচালিত হয় তাকে কখনো বৈধতা দেয়া যায় না। পুনরায় পবিত্র কুরআনের সূরা আল্-নহলের ১২৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যুদ্ধাবস্থায় কোন শাস্তি, সংঘটিত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এতে কখনো সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়। যুদ্ধ

সমাপনান্তে, কুরআনের শিক্ষা হল, ক্ষমা করে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

অনুরূপভাবে আল-আনফালের ৬২ নাম্বার আয়াতে পবিত্র কুরআন বলে, যখন দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে পড়ে এমনকি যুদ্ধের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে যায়, তখনও যদি বিরোধীপক্ষ সমঝোতায় আগ্রহ দেখায়, তবে অপরপক্ষের দায়িত্ব হল, এ ডাকে সাড়া দেয়া ও আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা রাখা। কুরআন বলে, অপরপক্ষে উদ্দেশ্যে বা আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়, বরং সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। কুরআনের এ শিক্ষা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার চাবিকাঠি।

সূরা আল-মায়েদার ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন, কোন দেশ বা জাতির প্রতি শত্রুতা যেন ন্যায় ও সমতার নীতিকে জলাঞ্জলী দিতে তোমাকে প্ররোচিত না করে।

বরং ইসলামী শিক্ষা হল, সকল পরিস্থিতিতে, তা যত কঠিনই হোক না কেন, আপনাকে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। নিশ্চিতভাবে একমাত্র ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সম্পর্কন্নোয়ন, অস্থিরতা দূরীকরণ ও যুদ্ধের কারণগুলো নির্মূল করা সম্ভব। সূরা আল-নূরের ৩৪ নাম্বার আয়াতে কুরআন বলে, যদি কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য তুমি কোন মুক্তিপণ নির্ধারণ কর, তবে তোমার শর্তসমূহ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, যেন তারা সহজেই তা পরিশোধ করতে পারে, আর যদি তাদেরকে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দাও, তবে তা হবে শ্রেয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার এক স্বর্ণালী নীতি পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হুজুরাতের ১০ নাম্বার আয়াতে প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, যদি দু'টো দেশ বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের উদ্ভব হয় তবে তৃতীয় পক্ষসমূহের উচিত মধ্যস্থতার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করা। চুক্তির পর যদি কোন এক পক্ষ অন্যায়ভাবে নির্ধারিত চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে অন্য দেশগুলোর উচিত হবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা। তবে, একবার যদি আগ্রাসী পক্ষ বিরত হয়, তাহলে তাদের ওপর অযথা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাও উচিত নয়; বরং স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন সমাজ হিসেবে তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।

বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলো ও জাতিসংঘের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আজকের বিশ্বে এ নীতির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, আর যদি তারা এ মূল্যবোধসমূহের নিরিখে কাজ করে তবে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ফলে অনাবশ্যক অস্থিরতার স্বাভাবিকভাবেই অবসান ঘটবে।

অনুরূপভাবে, আরো অনেক কুরআনী শিক্ষা রয়েছে যা হতে স্পষ্ট হয় যে, কীভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আর কীভাবে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটানো যেতে পারে। আমাদের পরম করুণাময় ও দয়ালু খোদা আমাদের হাতে শান্তির চাবি এ জন্য দিয়েছেন যে, তিনি চান তাঁর সৃষ্টি পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মাঝে বসবাস করুক এবং তাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ ও বিবাদ যেন না থাকে।

অতএব এ কথাগুলোর সাথে, আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো, পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগান। বিশ্বের যেখানেই বিশৃঙ্খলা বা সংঘাত দেখা দিক না কেন, আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হবে ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া এবং শান্তির প্রয়াসী হওয়া, যেন আমরা ৭০ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই বিভীষিকাময় যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারি, যার ভয়াবহ কুফলসমূহ দশকের পর দশক প্রকাশ পাওয়া অব্যহত থাকে আর হয়তো আজও হচ্ছে।

একদিকে যেখানে ক্ষুদ্র পরিসরে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে সেখানে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে সারা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করার পূর্বেই এবং ঐসব রোমহর্ষক ও ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করবে, পুনরায় ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং শান্তির লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

তাই, আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি আর ঐক্যবদ্ধ হই। একে অপরের বিরোধী শিবিরে অবস্থান না নিয়ে, আমাদের সবার উচিত একতাবদ্ধ হওয়া আর পারস্পরিক সহযোগিতা করা। আমাদের আর কোন কার্যকর পথ বাকি নেই, কেননা যদি একটি পূর্ণাঙ্গ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে এর পরিণামে যে বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসবে তা অকল্পনীয়।

সন্দেহ নেই যে, তখন পেছন ফিরে তাকিয়ে অতীতের যুদ্ধগুলোকে আমাদের কাছে খুবই ক্ষুদ্র বলে মনে হবে।

আমার এই দোয়াই থাকবে যে সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বিশ্ববাসী পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করবে, মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার সামনে নত হবে আর তাঁর অধিকারও প্রদান করবে আর পরস্পরের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করবে।

আল্লাহ্ তাদেরকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দান করুন যারা ধর্মের নামে সংঘাত সৃষ্টি করছে বা ভূ-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করছে। তাদের উদ্দেশ্য যে কতটা বিবেক-বুদ্ধিহীন ও ধ্বংসাত্মক সে সম্পর্কে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সকল সকল প্রান্তে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিস্থিতি তৈরি করে দিন - আমীন।

এ কথাগুলোর সাথে আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমি আপনাদেরকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক

মসজিদসমূহ– শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর

ক্যানাডার সাস্কাচুয়ান প্রদেশের রেজাইনা-তে মাহমুদ মসজিদের উদ্বোধন

৪ নভেম্বর ২০১৬ শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পশ্চিম ক্যানাডার সাসকাচুয়ান প্রদেশের রাজধানী রেজাইনাতে মাহমুদ মসজিদ-এর উদ্বোধন করেন। মসজিদে উপস্থিত হয়ে সম্মানিত হুযূর একটি স্মারক ফলক উন্মোচন ও আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া আদায় করে দোয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদটি উদ্বোধন করেন। সম্মানিত হুযূর এরপর নবনির্মিত মসজিদটি থেকে সাপ্তাহিক জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন যেটিতে তিনি মসজিদসমূহের প্রকৃত ও একান্তই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যায় মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রেজাইনার রামাদা প্লাজা হোটেলে এক বিশেষ সংর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্যানাডার আমীর লাল খান মালিক সংক্ষিপ্ত স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিও বক্তব্য রাখেন যাদের মধ্যে ছিলেন সাসকাচুয়ান প্রদেশের প্রিমিয়ার (মূখ্যমন্ত্রী) অনারেবল ব্র্যাড ওয়াল, রেজাইনার মেয়র অনারেবল মাইকেল ফুগেরে ও রেজাইনার পুলিশ প্রধান মি. ইভান ব্রে। সম্মানিত হুযূর (আই.) সংর্ধনাটিতে মূল বক্তব্য পেশ করেন, যার অনুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

এ সুযোগে সর্বপ্রথম আমি অতিথিবৃন্দকে আজকের এই সন্ধ্যায় আমাদের আমন্ত্রণে সদয়ভাবে সাড়া দিয়ে যোগ দেয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নন, আর তাই এখানে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আপনাদের উন্মুক্ত হৃদয় ও সহনশীলতার প্রকাশক আর তাই আমি আপনাদের প্রতি আমার হৃদয়-নিংড়ানো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেবল সৌজন্য বা ফাঁকা বুলি নয়, বরং এটি আমার বিশ্বাসের অংশ, কেননা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিখিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।

সুতরাং আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রকৃতপক্ষে আমার ধর্মীয় দায়িত্ব এবং এবং সেই ধর্মীয় শিক্ষার এক অনুপম অংশ যার উপর আমি, এবং প্রত্যেক আহমদী মুসলমান, আমল করে থাকেন। আমার কৃতজ্ঞতা আরো গভীর এ কারণে যে বর্তমানে আমরা অত্যন্ত নাজুক ও অস্থির সময় অতিবাহিত করছি এবং এ বিষয়টি ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য। আমরা সকলেই সম্যক অবহিত যে কতক মুসলিম চরমপন্থী গ্রুপ গঠিত হয়েছে এবং তারা ইসলামের নামে ভয়াবহতম নৃশংসতা পরিচালনা করে চলেছে। একদিকে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, অপরপক্ষে তারা তাদের নিজেদের নেতৃবর্গ ও শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে কতক সরকারও তাদের নাগরিকদের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, আর এর ফলস্বরূপ বিদ্রোহী গোষ্ঠীসমূহ গঠিত হয়েছে ও সহিংস বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হয়েছে। এ সব কিছুর ফল এই যে, কতক মুসলিম দেশে সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের বদলে এ জাতিসমূহ সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের এক নিরন্তর ও চরম কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘূর্ণিপাকে আটকা পড়েছে। যা ঘটছে তাকে মানবতার উপর এক চরম কলঙ্কই গণ্য করা যায়।

অবশ্য, এটি সত্য যে সংঘাত ও সহিংসতা কেবলমাত্র মুসলিম বিশ্বেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন কোন অমুসলিম দেশেও, বিশেষতঃ বিশ্বের মাঝে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশগুলোতেও আমরা গৃহযুদ্ধ ও অস্থিরতা লক্ষ্য করি। তথাপি, মুসলিম বিশ্বের সংঘাতসমূহই আজ বিশ্বের সংকটসমূহের কেন্দ্র বলে বিবেচিত এবং সর্বাধিক উদ্বেগের কারণ। এটি এ জন্য যে, কতকগুলো এমন তথাকথিত মুসলিম জঙ্গী ও চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা কেবল তাদের নিজ দেশেই নৃশংস বর্বতার পরিচালনা করছে না, বরং তাদের সন্ত্রাসবাদকে তারা বিদেশেও রপ্তানী করেছে। তাই, সাম্প্রতিককালে এখানে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও কয়েকটি ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ অন্যায্য আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, কেবল গত বছরেই প্যারিস, ব্রাসেল্‌স, অরল্যান্ডো ও অন্যান্য বড় বড় শহরে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছে যেখানে অগণিত নির্দোষ মানুষকে নির্দয় ও বর্বরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এমন ঘটনাসমূহ পাশ্চাত্য জগতে অমুসলিমদের মধ্যে আতঙ্কের এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আর এর ফলস্বরূপ আমরা ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামাতঙ্ক বলে পরিচিত বিষয়টির উত্থান লক্ষ্য করেছি। তাই, যদিও আপনারা এ অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন, আর এ সত্ত্বেও যে আহমদী মুসলিমদের সাথে আপনাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে, এটি খুবই সম্ভব যে, আপনাদেরও কারো কারো মনে আমাদের মসজিদ সম্পর্কে সংশয় ও ভীতি বাসা বেঁধে আছে।

আপনারা মনে করতে পারেন যে যতদিন আহমদী মুসলিমদের মসজিদ ছিল না, তারা এখানে সমাজের সুসংহত এক অংশ হিসেবে বাস করেছে। কিন্তু, এখন যখন তাদের নিজেদের উপাসনালয় হয়েছে, আপনারা আশংকা করতে পারেন যে, তারা হয়তো তাদের মসজিদের দ্বার অন্যদের জন্য রুদ্ধ করে দিবে, আর নিজেদেরকে বাকি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে; আর, যেটা আরো ভয়াবহ, তারা তাদের মসজিদকে চরমপন্থী কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করবে, আক্রমণসমূহের ষড়যন্ত্র করবে আর সমাজের শান্তিকে বিনষ্ট করবে। বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার পর যদি আপনাদের কারো মনে এমন কোন উদ্বেগ থেকে থাকে তবে আমি আপনাদেরকে দোষারোপ করবো না বরং প্রকৃতপক্ষে আমি এমন উদ্বেগকে পুরোপুরি বোধগম্য মনে করবো। এদিকে দৃষ্টি রেখে, শুরুতেই আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট করতে চাই যে, যে সকল উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মিত হয় সেগুলো অত্যন্ত মহৎ আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ না হয়ে বরং প্রকৃতপক্ষে এগুলো বিশ্বে প্রকৃত ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম স্বরূপ।

একটি মসজিদের প্রথম উদ্দেশ্য হল, মানুষের একত্র হওয়া ও সমবেতভাবে খোদা তা'লার ইবাদত করা এবং তাঁর সামনে ঝুঁকা ও নত হওয়া এবং তাঁর অনুগ্রহ ও ভালবাসা লাভের মিনতির স্থান হিসেবে কাজ করা। তবে, কেবল নিজের ব্যক্তিগত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করাই যথেষ্ট না বরং একজন মুসলমানের দায়িত্ব ধর্ম বা পটভূমির উর্ধ্বে উঠে অপরাপর সকল মানুষের জন্য দোয়া করা, কেননা ইসলামের মহানবী (সা.) বলেন যে, একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক যে, তিনি যেন অন্যের জন্য তা পছন্দ করেন, যা নিজের জন্য তিনি পছন্দ করেন। তাই, যদি আমরা নিজেদের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ কামনা করি তবে আমাদের অবশ্যই অন্যদের জন্যও তাই আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। সুতরাং, সংঘাত ও বিদ্বেষকে ছড়ানোর পরিবর্তে, সত্যিকারের মসজিদসমূহ মানুষকে একত্রিত করার জন্য এবং মানবজাতিকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বাঁধনে বাঁধার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।

মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজের জন্য যা কামনা কর অন্যের জন্যও তাই কামনা করা-র এ নীতির উপর সর্বোত্তম আমলকারী ছিলেন। মানুষকে তার স্রষ্টার নিকট থেকে দুরে সরে যেতে দেখে তাঁর যে চরম দুশ্চিন্তা ও মর্মযাতনা হতো, তার কারণে মহানবী (সা.) রাতের পর রাত সিজদাবনত হয়ে নিবেদিত চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করতেন।

মানুষ কেন আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে সংশোধিত হচ্ছে না এ চরম মর্মযাতনায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর প্রতিটি দোয়া পরিপূর্ণ ছিল। কেন তারা তাদের নিষ্ঠুর আচরণসমূহ পরিত্যাগ করতে সম্মত হয় না? কেন তারা অন্যায় ও পাপকর্ম পরিত্যাগ করে না? আর ফলস্বরূপ, কেন তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির ঝুঁকিতে ফেলছেন? মহানবী (সা.)-এর মর্মযাতনা ও মনঃকষ্ট এত গভীর ছিল এবং তাঁর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবস্থা এমন ছিল যে, পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন যে, মানবজাতি শান্তিতে জীবন-যাপন না করা আর তাদের স্রষ্টার অধিকার ও একে অপরের অধিকার পূর্ণ না করার কারণে তিনি কি "ক্ষোভে-দুঃখে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবেন।"

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রতিটি তন্তু থেকে মানবজাতির জন্য চিরন্তন অনুগ্রহ ও দয়ার এক প্রস্রবণ প্রবহমান ছিল, আর তাই তাঁর অনুসারী কোন প্রকৃত মুসলমান কখনো মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বা অন্যের ক্ষতি করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না।

বরং, তারা আল্লাহ্ তা'লার নিকট ইবাদতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রবেশ করে তাঁর কাছে এ মিনতি করার জন্য যে সমগ্র বিশ্ববাসী যেন শান্তির পথে একতাবদ্ধ হয় এবং পরকালে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং একটি প্রকৃত মসজিদ জীবনের সকল স্তরের সমস্ত মানুষের জন্য শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী; আর, খোদা না করুন, একটি মসজিদ যদি এ কল্যাণময় উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত না হয়ে থাকে তবে এটি এর মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ।

মহানবী (সা.)-এর সময় একবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সমাজের মাঝে অরাজকতার বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি তথাকথিত মসজিদ নির্মিত হয়। ফলস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে এটি লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে নির্দেশ দেন তিনি যেন মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেন কেননা সেটি মন্দ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল, আর খোদার ইবাদতের জন্য বা মানবতার অধিকার প্রদানের জন্য নির্মিত হয় নি। সুতরাং মসজিদটি গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়। এগুলো হল ইসলামের সেই সকল অনন্যসাধারণ শিক্ষা যেখানে মুসলমানদের শেখানো হয়েছে যে, মসজিদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হলে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে কেবলমাত্র তাদের স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত হলেই চলবে না, বরং এর পাশাপাশি অপরাপর মানুষের কল্যাণ কামনা নিজ অন্তরে সযত্নে লালন করতে ও তাদের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে।

সুতরাং সম্ভাব্য সকল আঙ্গিক হতে, খোদা তা'লার উপাসনাকে অন্তর্নিহিতভাবে মানবজাতির অধিকার আদায়ের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন যে ইসলামের শিক্ষার সারাংশ কেবল দু'টি বাক্যে করা যায় - প্রথমতঃ খোদা তা'লাকে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে ভালবাসা এবং তাঁর অধিকার আদায় করা, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসা এবং তাদের অধিকার আদায় করা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা এ শিক্ষার অনুসরণ করেছে আর তাই যেখানেই আমরা মসজিদ নির্মাণ করি অথবা আমাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের জনসেবার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সুপরিচিতি লাভ করে থাকি। যেখানেই প্রয়োজন দেখা দেয় মানবতার সেবায় প্রথম কাতারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দণ্ডায়মান হয়।

আমাদের মানবসেবামূলক কার্যক্রম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে পরিচালিত হয় এবং আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অভাবীদের স্বস্তি প্রদান এবং উন্নততর জীবন যাপনের জন্য তাদেরকে সুযোগ করে দেয়া। তাই আমাদের মসজিদসমূহ আমাদের জন্য কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনার স্থান নয় বরং এগুলো এমন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে যেখানে সমবেত হয়ে স্থানীয় মানুষের সেবায় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। একমাত্র পরিকল্পনা যা আমাদের আহমদী মসজিদসমূহে হয়ে থাকে তা এই নির্ণয়ের জন্য হয়ে থাকে যে, অভাবী ও বঞ্চিতদের দুঃখ-যাতনা প্রশমনে আমরা কিভাবে করতে পারি। একমাত্র পরিকল্পনা যা আমরা নিয়ে থাকি তা হল দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যে ভারাক্রান্তদের বোঝা লাঘবের উদ্দেশ্যে।

উদাহরণস্বরূপ বিশ্বের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারী মানুষের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শত শত স্কুল ও কয়েক ডজন হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। অনুরূপভাবে এমন অনেক গ্রামে ও মফস্বল শহরে আমরা বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছি যেখানে ইতোপূর্বে এর কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখানে পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করে পানির প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে উদাসীন হওয়া খুব সহজ। পানি সরবরাহ কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত কিছু অর্থ পরিশোধ করলেই আমাদের ট্যাপগুলোতে পরিস্কার পানির সরবরাহ নিশ্চিত হয়ে যায়, আর তাই এটা অনুধাবন করা অত্যন্ত দুস্কর যে এ অমূল্য সম্পদের জন্য আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য হতদরিদ্র অঞ্চলের মানুষেরা কতটা মরিয়া হতে পারে। পানি জীবনের জন্য অপরিহার্য অথচ বিশ্বের অনেক অংশে মানুষ রয়েছে যাদের কাছে পানির প্রাপ্যতা অত্যন্ত দুর্লভ বা একেবারেই শূন্য। আফ্রিকার দেশগুলোতে যদি বৃষ্টি হয় তবে তাদের ডোবাগুলোতে পানি জমতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃই সেখানে খরা থাকে এবং জলাশয়গুলো শুকিয়ে যায়, ফলে পানির গুরুতর ঘাটতি দেখা দেয়। বস্তুতঃ, যখন বৃষ্টিপাতও হয়, তখনো পল্লী বা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী এসব মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না। কেননা যে ডোবার পানি তারা ব্যবহার করে তা নানা প্রকারের ব্যাক্টেরিয়া ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে দূষিত থাকে। একই পানি তারা পানও করে, আবার সেটাতেই তারা গোসল, রান্না ও কাপড় ধোয়ার কাজও করে, পশু-পাখিও এ পানিই পান করে, আবার পশু-পাখির মল-মূত্রেও তা প্রায়ই দুষিত হয়ে থাকে। তদুপরি এমন না যে, ট্যাপে ময়লা পানি পাওয়া যায় বরং ছোট্ট শিশুদের কয়েক কিলোমিটার হেঁটে মাথায় কলসিতে করে আসতে হয়।

আমি নিজে বেশ কয়েক বছর আফ্রিকাতে বাস করেছি আর তাই এটি আমি নিজের চোখে দেখেছি। যে বয়সে ছোট্ট শিশুদের স্কুলে যাওয়া উচিত আর ভারমুক্ত থাকা উচিত, তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের রূঢ় বাস্তবতা তাদেরকে এমন এক দৈনিক রুটিন মেনে নিতে বাধ্য করে যা পাশ্চাত্যের স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসকারী আমাদের মত মানুষের কাছে অকল্পনীয়। এখানে উন্নত বিশ্বে মানুষের দৈনন্দিন উদ্বেগগুলো সে তুলনায় তুচ্ছ। আমাদেরকে সর্বোচ্চ যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয় তার মধ্যে রয়েছে সকাল বেলা সন্তানদের সময়মত স্কুলে পৌঁছানো বা এমনই ছোট-খাট বিষয়াদি। এরকম নগণ্য সমস্যা বিশ্বের বঞ্চিত অংশের মানুষের কাছে অনেক দূরের স্বপ্ন। আমাদের শিশুরা এখানে যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় তার জন্য ঐ সব শিশুরা নিজেদের সর্বস্বও দিয়ে দিবে। প্রতিদিন বহু দূর পথ হেঁটে পরিবারের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পানি

আনার বদলে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা কি না করবে?

তাই এমন মানুষদের জন্য কিছুটা আরাম সৃষ্টির জন্য আর আক্ষরিক অর্থেই তাদের পিপাসা নিবারণের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হাতে বা সৌরশক্তিতে চালিত পানির পাম্প স্থাপন করে তাদের জন্য পরিস্কার সুপেয় পানির ব্যবস্থা করছে। অনেক সময় আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সেই মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও ধারণ করে যখন স্থানীয়রা প্রথমবারের মত কল থেকে পানি নির্গত হতে দেখে আর পরে আমাকে সেগুলো দেখিয়ে থাকে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটানোর পর নিজেদের দোরগোড়ায় পরিস্কার পানি জীবনে প্রথমবারের মত দেখে স্থানীয় মানুষের, বিশেষ করে ছোট্ট শিশুদের, চেহারায় যে নির্মল ও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় তা সত্যিই দেখার মত দৃশ্য! মনে হয় যেন তাদের সকল আশা ও স্বপ্ন একইসাথে পূর্ণ হয়েছে আর যেন সারা পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার তারা লাভ করেছে।

আমরা, আহমদী মুসলমানেরা, এমন মানুষের সেবা করতে পেরে গর্বিত এবং আমরা একে আমাদের সৌভাগ্য মনে করি যে আমরা অপরের জন্য আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করার সুযোগ পাচ্ছি, কেননা এটিই ইসলামের জীবনধারা। এর ফলস্বরূপ যেখানেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মসজিদ নির্মাণ করে, শীঘ্রই স্থানীয় মানুষ এটি অনুধাবন ও প্রকাশ্যে স্বীকার করতে শুরু করে যে, আমরা নিঃস্বার্থভাবে, ধর্মীয় মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে, মানবতার সেবা করছি, আর সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সমাজের জন্য অবদান রাখছি। একইভাবে আহমদী মুসলিমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষকেও সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করে থাকে। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, হারিকেন ম্যাথিউ হাইতিতে ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়। এতে আমাদের জামা'ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানবিক ত্রাণ সংস্থা হিউম্যানিটি ফার্স্ট সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করে, আর তারা ত্রাণ তৎপরতায় রয়াল ডাচ নেভী (হল্যান্ডের নৌ বাহিনী)-কে সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম হয়।

আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টার প্রভাব এত গভীর ছিল যে, ডাচ নৌ তরীর কমান্ডার পরবর্তীতে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এক পত্রে লেখেন যে, তিনি কখনো অন্য কোন সংগঠনকে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর দলের ন্যায় নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা ও আত্মত্যাগের সাথে কাজ করতে দেখেন নি। সুতরাং, আমি আবারো বলছি যে, প্রকৃত মসজিদসমূহ ও প্রকৃত মুসলমানদের থেকে সংকিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আমাদের জিহাদ সন্ত্রাস ও সহিংসতার মিথ্যা জিহাদ নয়, বরং আমাদের জিহাদ সেটি যা ইসলামের মহানবী (সা.) শিখিয়েছেন ও নিজে অনুশীলন করেছেন। একবার এক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, যা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, থেকে ফিরার পর তিনি তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এখন আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরে এলাম অনেক বড় জিহাদের দিকে, যা হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকার আদায় করা এবং নিজেদের আত্মার সংশোধন সাধন করা। তাই আমাদের জিহাদ তরবারী, বন্দুক বা বোমার জিহাদ নয়। আমাদের জিহাদ নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও অত্যাচারের জিহাদ নয়। বরং আমাদের জিহাদ হল ভালবাসা, অনুগ্রহ ও সহমর্মিতার জিহাদ। আমাদের জিহাদ সহিষ্ণুতা, ন্যায় ও মানবীয় সহানুভূতির জিহাদ। আমাদের জিহাদ হল খোদা তা'লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়ের জিহাদ। যদি আমরা কোন জিহাদী দল গঠন করে থাকি, তবে তার উদ্দেশ্য নিরীহ মানুষের উপর নৃশংস আক্রমণ করে তাদের হত্যা করা নয়, অথবা ক্লাব, স্টেশন বা অন্য কোথাও ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনা করা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হল সর্বত্র, সকল সময়ে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে গিয়ে আমরা সহিংসতার সাথে তরবারী বা আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করি না, বরং আমাদের পছন্দের হাতিয়ার হল ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি আর সর্বোপরি, দোয়া। তাই, এখন যেহেতু এ মসজিদের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে আমি আস্থা রাখি যে স্থানীয় আহমদী মুসলমানগণ কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতেই বেশি মনোযোগী হবেন না বরং এর পাশাপাশি মানবতার সেবার উপরও আরো বেশি মনোনিবেশ করবেন। আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে আপনারা দেখবেন যে এ মসজিদ এক আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে যা সমাজকে কল্যাণকামিতা, সহানুভূতি ও অনুগ্রহের সার্বজনীন মূল্যবোধসমূহের আলোয় আলোকিত করবে। আপনারা দেখবেন কিভাবে এ মসজিদ শান্তি ও সমৃদ্ধির এ মহান প্রতীকে পরিণত হবে এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক অভয়াশ্রম সাব্যস্ত হবে।

অবধারিতভাবে, পবিত্র কুরআন প্রতিবেশীর অধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে, এমনকি ইসলামের মহানবী (সা.) একবার বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার প্রতি তাঁর মনোযোগ এত বেশি আকর্ষণ করেছেন যে একসময় তাঁর মনে হতে লাগলো যে, প্রতিবেশীদের বুঝি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হবে। সুতরাং যদি এর পরও কোন প্রতিবেশীর মনে এ মসজিদ সম্পর্কে কোন সংশয় বা সংকা থেকে থাকে তবে সেগুলোকে চির তরে মিটিয়ে দেয়া উচিত। আমরা আহমদী মুসলমানেরা প্রতিবেশীদের সেবা করতে চাই, তাদের রক্ষা করতে এবং তাদেরকে সম্মান করতে চাই যেন আমাদের ধর্মের উদ্দেশ্যকে আমরা পূর্ণ করতে পারি। স্থানীয় আহমদী মুসলমানেরা, খোদার ইচ্ছায়, নিজেদেরকে স্থানীয় সমাজের বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান সদস্য সাব্যস্ত করবে, এবং যথাসাধ্য আপনাদের সকলের সেবায় ব্রতী হবে। আল্লাহ্ তাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এ কথাগুলোর সাথে আমি আরেকবার আপনাদেরকে আজ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং এ কথা পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে আমাদের মসজিদ সদা শান্তি ও সৌহার্দ্যের এক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং এর দ্বার সদা সকল ধর্ম ও মতের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক

শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশনা

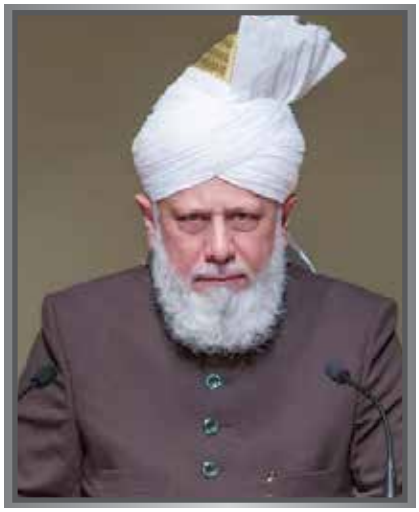

শরীয়তের কতিপয় মৌলিক বিষয় নিয়ে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশনা যা বিভিন্ন সময় এম.টি.এর অনুষ্ঠানে এবং চিঠির জবাবে হুযূর দিয়েছেন। আর তা প্রথমবার সবার সুবিধার্থে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

(ইংরেজি মূল: জহির আহমদ খান, রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তর, লন্ডন)

(অনুবাদ: মওলানা মসীহ্ উর রহমান, ওয়াকফে যিন্দেগী)

প্রথম কিস্তি

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত আমীরুল মু'মিনীনের (আই.) সমীপে এক ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের কুরআন স্পর্শ করা এবং কম্পিউটার, আইপ্যাড ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করা বিষয়ে বিভিন্ন ফিকাহবিদদের উক্তি সম্বলিত তুলনামূলক গবেষণা পত্র পেশ করে হুযূরের সদয় নির্দেশনার অনুরোধ করেন।

হুযূর (আই.) তার ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর লেখা চিঠিতে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন:

"এই বিষয়ে ফিকাহবিদ এবং ইসলামী দার্শনিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। শরীয়তের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গরা কুরআনের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।"

"পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী (সা.)-এর হাদিস এবং মসীহ মওউদ (আ.)-এর রায় অনুসারে, এই বিষয়ে আমার মত এটাই যে, মাসিকের সময়ে একজন মহিলা তার মুখস্ত করা কুরআনের অংশ যিক্‌র হিসেবে মৌখিকভাবে পড়তে পারে। এছাড়া যদি গুরুতর প্রয়োজন হয় তাহলে সে পবিত্র ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কুরআন ধরতে পারে এবং কাউকে রেফারেন্স দেয়ার জন্য অথবা শিশুদের কুরআন শিখানোর স্বার্থে কুরআনের অংশ পড়তেও পারবে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে কুরআন পড়তে পারবেন না।"

"একইভাবে ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কম্পিউটার, ইত্যাদি দেখেও কুরআন পড়তে পারবে না, যদিও সে কুরআন শারীরিকভাবে স্পর্শ করবে না। কিন্তু জরুরী ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স খুঁজতে বা কাউকে কোনো রেফারেন্স দিতে সে কম্পিউটারে কুরআন পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই।"

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করা

মহিলাদের ঋতুস্রাবকালীন সময়ে আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া বিষয়ে এক মহিলা বিভিন্ন হাদিস সম্বলিত একটি চিঠি হুযূরের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের মসজিদে মিটিং-এ যোগদান করা এবং ঋতুবতী অ-আহমদী মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শনের অনুমতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হুযূরের কাছে নির্দেশনার জন্য অনুরোধ করেন।

এই বিষয়ে হুযূর (আই.) তার ২০২০ সালের ১৪ মে-র চিঠিতে নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেন:

"হযরত রসূলে করীম (সা.) মহিলাদের ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদে কিছু নিয়ে আসা এবং মসজিদে বসা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।

যেহেতু আপনি আপনার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) তার স্ত্রীদের ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে মাদুর বিছাতে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে বসার বিষয়ে হাদিসে হুযুর (সা.) স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।"

"অতএব, হুযূর (সা.) দুই ঈদের নামাযে অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের পর্দা করে ঈদের নামাযে যোগ দিতে এমনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি মেয়েরা ঋতুবতী হয় এবং তাদের কাছে যদি পর্দার ব্যবস্থা না-ও থাকে, তাহলে তারা যেন তাদের বোনদের কাছ থেকে স্কার্ফ ধার নিয়ে ঈদের নামাযে যায়। কিন্তু তিনি (সা.) ঋতুবতী মহিলাদের মূল নামায ঘরের বাহিরে থেকে নামাযের পর দোয়ায় যোগদানের অনুমতি দিয়েছেন।"

"একইভাবে বিদায় হজ্বের সময় যখন সকল মুসলমানরা হজ্বের আগে ওমরা সম্পন্ন করছিল তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঋতুকালীন সময় চলছিল। এই কারণে হুযূর (সা.) তাকে ওমরা করার অনুমতি দেন নি। কেননা ওমরার সময় কাবার তাওয়াফের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় মসজিদে থাকতে হয়। যখন হজ্বের পর তার মাসিক শেষ হয়ে যায়, তাকে ওমরার অনুমতি দেয়া হয়।"

"তাই হাদিসে এরকম স্পষ্ট নির্দেশনা থাকায় আমাদের কাছে নতুন কোন পথ নেই যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।"

"এই ব্যাপারে বাস্তবতা হল, অতীতে অনেক মহিলার কাছে বর্তমানের মতো আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সহজলভ্য ছিল না। এটি সঠিক যে, তাদের কাছে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের সামর্থ ছিল না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা একেবারেই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতো না এবং তাদের পোষাক নোংরা হয়ে যেত। মানুষ প্রত্যেক যুগেই তার প্রয়োজন পূরণে সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাই মহিলারা অতীতেও এবং আজও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে।"

"অধিকন্তু অবশ্যই বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে। অনেক মহিলা এমন রয়েছেন যাদের রক্তপাত বেশি হয়। যার ফলে প্যাডে লিকিংস এর কারণে কাপড় রক্তে নোংরা হয়ে যায়।"

"এভাবেই প্রত্যেক যুগে ইসলামের শিক্ষা অনুসৃত হবে আর এই ধারাবাহিকতা চিরস্থায়ী এবং যেভাবে রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে অনুসৃত হয়েছে তেমনি সবযুগেই এই শিক্ষা সর্বজনবিদিত। যদিও কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে, নামাযের ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘর নেই। তাহলে এমন কোন জায়গা নির্বাচন করুন যেমন রুমের পিছন দিকে দরজার কাছে যেখানে সাধারনত কেউ নামায পড়ে না। ঋতুবতী মেয়েরা সেখানে বসতে পারেন। অন্যথায় নামাযের জায়গার পিছন দিকে এমন জায়গায় এদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে সাধারনত নামায পড়া হয় না।"

"আর অমুসলিম মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শন করার বিষয়ে মনে রাখতে হবে, প্রথমত তাদেরকে সাধারনত মসজিদে বসানো হয় না বরং তাদের হেটে হেটে মসজিদ পরিদর্শন করানো হয়। আর এই সময়টা ততটাই হয় যতটা মসজিদ থেকে মাদুর আনতে বা মাদুর বিছাতে লাগে। আর যদি তাদের নামাযের জায়গায় বসাতেই হয় তাহলে তাদের নামাযের মাদুরে না বসিয়ে বরং তাদের নামাযের জায়গার শেষে পিছনের দিকে চেয়ারে বসাবেন।"

উপরোক্ত জবাবে হুযূর (সা.)-এর ঋতুবতী মহিলাদের ঈদের নামাযের দোয়ায় যোগদানের স্পষ্ট নির্দেশনাও হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন।

ঈদের খুতবা শোনা বিষয়ে একই রকম প্রশ্নের জবাবে হুযুর (আই.) হাদিসের আলোকে জবাব দিয়েছেন যা সবার জ্ঞাতার্থে নিচে তুলে ধরা হল।

ঈদের খুতবা না শোনার বাধ্যবাধকতা

দারকুতনী শরীফের এক হাদিস যেখানে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর (সা.) বলেছেন যে, একবার ঈদের নামাযের পর খুতবার আগে হুযূর (সা.) বলেন, যারা থাকতে ইচ্ছুক তারা থাকতে পারে আর যারা যেতে চায় তারা চলে যেতে পারে। এক ব্যক্তি হুযুর (আই.)-কে জিজ্ঞাসা করেন এই হাদিস ঠিক কি না।

"এই প্রশ্নের জবাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর দেয়া চিঠিতে বলেনঃ-

"আপনি আপনার চিঠিতে দারকুতনীর যে হাদিস উল্লেখ করেছেন সে হাদিস আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।"

"এটা ঠিক যে, রসূলে করীম (সা.) ঈদের খুতবা শোনার ব্যাপারে ততটা জোর দেন নি। যতটা তিনি জুমুআর খুতবা নীরবতার সাথে শোনার এবং জুমুআর নামায পড়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে ফিকাহবিদরা ঈদের নামাযকে সুন্নত এবং মুস্তাহাব আখ্যা দিয়েছেন।"

"যদিও এর পাশাপাশি সবার মনে রাখা উচিত, হুযূর (সা.) ঈদের নামাযে এবং নামাযের পর দোয়াতে অংশ নেয়াকে বরকতময় পুণ্যকর্ম হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (সা.) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাদের কাছে স্কার্ফ নেই তারা যেন তাদের বোনের থেকে স্কার্ফ ধার নিয়ে ঈদের নামাযে অংশ নেয়। একই সাথে তিনি (সা.) ঋতুবতী মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশ নিতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তাদের উচিত নামাযের জায়গার বাহিরে অবস্থান করে দোয়ায় অংশ নেয়া।"

বাড়িতে ই'তিকাফ করা

একজন মহিলা রমযানে ই'তিকাফ করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেন:

"আমরা কি রমযানে নিজ বাড়িতে তিন দিন ব্যাপী ই'তিকাফ করতে পারি?"

হুযূর (আই.) ২০১৫ সালের ৯ আগস্ট দেয়া চিঠিতে নিম্নোক্ত উত্তর দেনঃ-

"হযরত রসূলে করীম (সা.) সুন্নত অনুযায়ী রমযানের ই'তিকাফের নিয়ম কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রমযানে বাড়িতে তিন দিন ব্যাপী ই'তিকাফ করা যাবে না।"

"হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবন থেকে প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) রমযানে কমপক্ষে দশ দিনের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। যেভাবে এই হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাব আল ই'তিকাফি ফিল আশারিল আওয়াখিরি ওয়াল ই'তিকাফি ফিল কুল্লীহা)

একইভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা রমযান সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ই'তিকাফ নিয়েও নির্দেশনা দিয়েছেন। যেখানে তিনি বলেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থঃ তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রী গমন করো না। *(সূরা আল বাকারা: ১৮৮)*

অর্থাৎ প্রথমত, রমজানে ই'তিকাফ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে শারিরীক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত, ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থান হল মসজিদ।

ই'তিকাফ শুধুমাত্র মসজিদেই হতে পারে এই ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাই। যেমন,

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

'হযরত আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, সওম না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মাসজিদে ই'তিকাফ করবে।

(সহীহ আবু দাউদ, কিতাবুস সিয়াম, বাব আল মুতাকিফি ইয়ায়ুদুল মারিদা)

"সুতরাং কুরআন করীম এবং রসূল (সা.)-এর ভাষ্য অনুসারে ই'তিকাফের রীতি হল জামে মসজিদে দশ দিন যাবত ই'তিকাফ করা।"

কিন্তু যদি কেউ রমজানের দিন ব্যতীত অন্য সময় নিজেদের বাড়িতে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে ইবাদত করে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনা করে, তাহলে এটি অবশ্যই ভালো কাজ। এক্ষেত্রে অবশ্যই অনুমতি রয়েছে এবং আমরা এক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা পাই না। এছাড়া কতক ফিকাহবিদ মনে করেন, মহিলাদের জন্য বাড়িতে ই'তিকাফ করা উত্তম। ফিকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব হিদায়া'-তে বলা হয়েছে,

اما المرأة تعتكف فى مسجد بيتها

"এটাই যে, মহিলারা ই'তিকাফ বাসার সেই জায়গায় করতে পারবে, যেখানে তারা নামায আদায় করে।"
[আল-হিদায়াহ ফি শার্হি বিদায়াতিল-মুবতাদি, বাব আল-ই'তিকাফ]

এই ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন:

"مسجد کے باہر اعتکاف ہو سکتا ہے مگر مسجد والا ثواب نہیں مل سکتا"

"মসজিদের বাহিরে ই'তিকাফ হতে পারে, তবে মসজিদের সওয়াবটা পাওয়া যাবে না।" [আল ফযল, ৬ মার্চ- ১৯৯৬]

স্কার্ফ পরার সঠিক সময়

২০১৩ সালের ১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ায় 'গুলশানে ওয়াকফে-নও' অনুষ্ঠানে এক মেয়ে হুযূর (আই.)-কে মেয়েদের স্কার্ফ পরার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, জবাবে হুযূর (আই.) বলেন,

"তুমি যখন ৫ বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তোমার ফ্রকের নিচে পায়জামা না পরে বাহিরে যাওয়া উচিত নয়। তোমার পা আবৃত থাকা উচিত যাতে তুমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারো যে, তোমার পোষাক শালীন হওয়া উচিত। তোমার হাফহাতা ফ্রক পরা উচিত নয়।"

"এরপর তুমি যখন ৬-৭ বছরের হবে তখন তোমার পায়জামার ব্যাপারে আরো সতর্ক থাকা উচিত। আর তোমার বয়স যখন ১০ হবে তখন তোমার ছোট স্কার্ফ পরার অভ্যাস করা উচিত।"

"তোমার বয়স যখন ১১ হবে তখন তোমার রীতিমত স্কার্ফ পরা উচিত। তখন স্কার্ফ পরার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়া উচিত নয়। এমনকি উপমহাদেশীয় মানুষরা এখানে শীতকালেও স্কার্ফ পরিধান করে। তারা কি ঠাণ্ডায় কান ঢাকে না? শুধুমাত্র একটি স্কার্ফ ব্যবহার করে। এভাবে স্কার্ফ পরিধান করো।"

"এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের বয়স ১০ হলেও তাদের দেখতে অনেক ছোট লাগে। আবার অনেকেই আছে যাদের দেখে মনে হবে তাদের বয়স ১২ বছর। যদিও তাদের বয়স মাত্র ১০ বছর। উচ্চতার জন্য তাদের বড় লাগতে পারে। সুতরাং এমন মেয়েরা যাদের দেখতে বড় লাগে তাহলে তার অবশ্যই স্কার্ফ পরা উচিত।"

"যদি তুমি শৈশব থেইে স্কার্ফ পরার অভ্যাস করে নাও তাহলে তোমার পরে আর লজ্জা লাগবে না। অন্যথায় সারাজীবন তোমার স্কার্ফ পরতে লজ্জা লাগবে। যদি তুমি বলো যে, তুমি যখন ১২-১৪ বছরের হবে তখন স্কার্ফ পরবে তাহলে এই চিন্তা বড় হলেও থেকে যাবে আর পরবর্তীতে লজ্জার কারণে স্কার্ফ পরার মানসিকতাই নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বলবে যে, অন্য মেয়েরা আমাকে উপহাস করবে। আমি যদি স্কার্ফ পরি তাহলে তারা হাসাহাসি করবে।

"সুতরাং এখন থেকেই মাঝে মাঝে স্কার্ফ পরার অভ্যাস করো। ৭-৮ বছর বয়সে তুমি স্কার্ফ পরা শুরু করো এবং অবশ্যই অন্য মেয়েদের সামনে পরা আরম্ভ করো যাতে তুমি আর লজ্জাবোধ না করো এবং যখন তুমি বড় হতে শুরু করবে তখন স্কার্ফ পরিপূর্ণভাবে পরা আরম্ভ করো। ঠিক আছে? তুমি বুঝেছ?

"তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। বড় মেয়েদের এটা অনুধাবন করা আবশ্যক যে, পর্দা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য হল, শালীনতা। যারা পশ্চিমা এবং ইউরোপিয়ান সমাজের প্রভাবে চলে আসে তাদের জানা উচিত, অতীতে এই মানুষরাও শালীন লম্বা পোষাক পরিধান করতো। তারা সাধারনত লম্বা ঢিলে কাপড় পরতো। এখন তারা নগ্ন হয়ে ঘুরছে।

"সমস্যা হল, তারা মনে করে পুরুষদের ফুল প্যান্ট এবং কোট টাই-তে সুদর্শন লাগে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে যে, তারা যখন মিনিস্কার্ট পরিধান করে তখন তাদের ভালো লাগে। আমি এই যুক্তি একদমই বুঝতে পারি না।

সুতরাং পুরুষদের কথা ভেব না। মনে রাখবেন, যে মহিলারা নিজেদের অনাবৃত রাখে তারা নিজেরা নিজেদের অসম্মান করে। মূলত, একজন আহমদী নারী ও মেয়ের মর্যাদা তার শালীনতার মধ্যে নিহিত। মূল কথাই হল, শালীনতা। একমাত্র নম্রতা, শালীনতাই অন্যদের খারাপ দৃষ্টি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে।

ফরয রোযা রাখার সঠিক বয়স

২০১৩ সালের ১২ অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় একই 'গুলশানে ওয়াকফে-নও' অনুষ্ঠানে অন্য এক মেয়ে হুযূর (আই.)- কে রমযানে ফরয রোযা রাখার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

জবাবে হুযূর (আই.) বলেন,

"রোযা তখন আপনার উপর ফরয হবে যখন আপনি একদম বড় হয়ে যাবেন। যদি আপনি ছাত্র হন এবং আপনার পরীক্ষা চলছে আর আপনার বয়স ১৩-১৫ বছর হয় তাহলে আপনার রোযা রাখা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যদি রাখতে চান তাহলে ১৫-১৬ বছর বয়সে রোযা রাখা যেতে পারে।"

"কিন্তু যখন আপনার বয়স ১৭-১৮ বছর হবে তখন রোযা আপনার উপর ফরয হবে। তখন আপনার অবশ্যই রোযা রাখা উচিত। কিন্তু আপনি যদি রোযা রাখা পছন্দ করেন তাহলে আপনি এক দুটি রোযা ৯-১০ বছর বয়সে রাখতে পারেন। যদিও তা ফরয না।"

"রোযা আপনার উপর তখন ফরয যখন আপনি বড় হয়ে যাবেন এবং আপনি রোযা সহ্য করতে পারবেন। অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন ঋতুতে সময়ের পার্থক্য কত? আপনাদের এখানে দিনের আলো কতক্ষণ থাকে? সেহরী এবং ইফতারীর মাঝে সময়ের পার্থক্য কত? ১২ ঘণ্টা? গ্রীস্মের সময় কত? আপনারা কি ১৯ ঘণ্টা রোযা রাখেন? হ্যাঁ, তাহলে আপনারা ১৯ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারবেন না।

গত গ্রীস্মে ইউ. কে-তে রোযার সময় অনেক বেশি ছিল আর তোমাদের রোযা রাখার সময় কম ছিল। ইউ. কে- তে আমরা সাড়ে ১৮ ঘণ্টা রোযা রেখেছি। কিন্তু সুইডেনের মত অনেক দেশে ২২ ঘন্টা রোযা রাখে। যাইহোক আমাদের এই সময় পূর্নবিন্যাস করা দরকার। কেননা কেউ এত লম্বা সময় রোযা রাখতে পারে না। কিন্তু যখন আপনারা বড় হবেন তখন আপনাদের মাঝে সহ্যক্ষমতা তৈরি হবে।

আপনি যখন ১৭-১৮ বছর বয়সে উপনীত হবেন। তখন রোযা রাখলে সমস্যা নেই। তখন আপনার রোযা রাখতে হবে। বুঝেছেন?

তোমার পিতামাতারা কি বলছেন? তারা কি বলছে যে, তোমাদের ১০ বছর বয়সেই তোমাদের উপর রোযা ফরয? যাহোক, তোমাদের নিজেদের অভ্যাস করা উচিত। ছোট বাচ্চাদের প্রতি রমযানেই ২-৩ টি রোযা রাখা উচিত। যাতে তারা রমযানের আগমন উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু যদি আপনারা রোযা না-ও রাখেন তবুও রাতে উঠুন এবং আপনার পিতামাতার সাথে সেহরী খান। নফল পড়ুন এবং নিয়মিত ফযরের নামায পড়ুন।

তোমাদের মত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রমযানে অবশ্যই রাতে উঠা এবং সেহরি খাওয়া উচিত এবং সকল প্রস্তুতির সাথে সেহরীর আগে ২-৪ রাকাত নফল পড়ুন। নিয়মিত ফরয নামায পড়ুন এবং নিয়মিত কুরআন পড়ুন।

https://www.alhakam.org/answers-to-everyday-issues-part-i/

পর্ব-৩

সুইডেন থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে প্রিয় হুযূর (আই.)-এর মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় তাহলে সেই যুদ্ধে কোন্ কোন্ দেশ অংশ নেবে?

প্রিয় হুযূর (আই.) উত্তরে বলেন: আমি হুবহু বলতে পারব না যে, কোন্ কোন্ দেশ জড়িয়ে পড়বে, সারা পৃথিবীই হয়তো জড়িয়ে পড়বে। একদিকে এই বিশ্ব একটি (গ্লোবাল ভিলেজ বা) বৈশ্বিক গ্রাম নামক স্লোগান দিয়ে থাকে। ব্লক বা জোট তো হয়েই আছে। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে সবাই অংশগ্রহণ করবে, পরাশক্তিরা চেষ্টা করবে দূর্বল দেশসমূহকে পরাভূত করার, আমেরিকা চাইবে চীনের ওপর তাদের কতৃত্ব বজায় রাখতে আর ভারতও তাদেরকে যেন সহায়তা করে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং আফ্রিকায় নিজেদের কতৃত্ব বজায় রাখতে চাইবে। তাই মনে হয়, সারা পৃথিবী এতে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। হয়তো দু'চারটি দেশ এর থেকে নিরাপদ থাকবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তো খুব বেশি দেশ অংশগ্রহণ করে নি। নিউজিল্যান্ড তো বিশ্বের একেবারে এক প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু তাদের সৈন্যসামান্তও উক্ত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর এখন তো মনে হয় সারা পৃথিবী এক হয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতে এরূপ ব্লক সৃষ্টি হলে আরো ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হবে। তাই এমনিতে বড় বড় পরাশক্তি নিজ নিজ জোট প্রতিষ্ঠা করবে। আর দূর্বলদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করবে।

প্রশ্ন: শিশুদের কি রোজা রাখা উচিত?

উত্তর: সন্তানের বয়স ১২ হবার পূর্বে তাদেরকে রোজা রাখার আদেশ দেয়াই উচিত না। ১২ বছর বয়সের অনতিপর রোজার দিন ছোট হলে তাদেরকে রোজা

রাখার কথা বলা যেতে পারে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেছেন যে, তাঁকে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) ১২ বছর বয়সে প্রথম রোজা রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটি বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার সময়। তাই তাদেরকে এ সময় বাধ্য করা উচিত নয়। এ সময় স্বেচ্ছায় যদি কেউ রোজা রাখতে চায় তাহলে তাকে রাখতে দিন। কিন্তু তাকে বলুন, এত বড় রোজা তুমি সম্পন্ন করতে পারবে না। তাই যদি রোজা রাখতেই হয়, তাহলে মনে মনে এই চিন্তা করে রাখো যে, যদি ক্ষুধা সহ্য করতে না পরি তাহলে রোজা ভেঙে ফেলব। তাহলে এই নিয়্যতের পুণ্য তুমি লাভ করবে। প্রথমত বর্তমানে আমরা তো এখানে প্রায় ১৮ ঘন্টা রোজা রাখি। ১৮ ঘন্টার পর আপনি রোজা ভেঙে ফেলুন, ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে মিল রেখে অন্যথায় আপনি দিন আর রাতের হিসাব করলে আপনার রোযা হবে ২২ ঘন্টা। অর্থাৎ সুইডেনে। আশা করি আমি সঠিক বলছি, মে-জুনে সেখানে ২২ ঘন্টাই হয়ে থাকে। অআহমদীরা এভাবে বলপ্রয়োগ করে রোযা রাখায়। বিশেষভাবে পাকিস্তানে তো এরূপ করেই থাকে। একবার দীর্ঘ এক রোজার দিনে রোজাদার এক বাচ্চা পিপাসায় বারবার পানির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। সন্ধায় যখন অন্যান্য বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে আসে যে, দেখ, আমাদের সন্তান তো রোযা রেখেছে। রুমের দরজা খুলে দেখল পিপাসায় বাচ্চা মরে পড়ে আছে। এরূপ বলপ্রয়োগ একেবারে অন্যায়। বাচ্চাদের বয়স যখন ১৫-১৬ বছর হয়, তখন তাদের মাঝে রোযা রাখার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। আর ১৮ বছর বয়সে যখন বালেগ হয় ও সুস্থ্য সবল থাকে, তখন থেকে নিয়মিত রোযা রাখা উচিত। তবে অরেকটু স্পষ্ট করে দেই, ১৮ই রোযা রাখার নির্দিষ্ট বয়স নয়, এটি মূলত সুস্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন: ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই, এর সাথে রোযার কোন সম্পর্ক আছে কি?

হুযূর (আই.) উত্তরে বলেন: প্রথম কথা হল, রোযার সাথে 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন'-এর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই এর অর্থ হল, তুমি কাউকে বলপূর্বক মুসলমান বানাতে পারো না। আবার কেউ যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করতে চায় তাহলে তুমি তাকে বলপূর্বক ধরে রাখতে পারো না। এর অর্থ এমনটি নয় যে, আপনি বলে দিলেন, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই তাই খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সাহেব আমাকে নিয়মিত নামায পড়তে বলেন, আমার ইচ্ছা হলে নামায পড়বো, ইচ্ছা না হলে পড়ব না কেননা ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। আদৌ এ কথা বুঝানো হয় নি। আপনি নিজেকে যখন কোন ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবি করেন, তখন সেই ধর্মের শিক্ষার ওপর আমল করা আবশ্যক। অতএব মুসলিম হিসেবে পাঁচবেলার নামাযও আদায় করতে হবে, রোযা রাখার বয়সে উপনীত হলে রোযাও রাখতে হবে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিত্তশালী হওয়ার পর পথের নিরাপত্তা থাকলে হজ্জও করতে হবে। যদি নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে যাকাতও আদায় করতে হবে। এগুলোই ইসলামের শিক্ষা। ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই- এ কথার অর্থ হল, যদি তুমি মনে করো যে, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করতে পারবে না, বান্দার অধিকারও প্রদান করতে পারবে না, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী চলতে পারবে না এবং ইসলাম পরিত্যাগ করবে- সেক্ষেত্রে তোমার জন্য জাগতিক কোন বাধ্যবাধকতা নেই, জাগতিক কোন শাস্তিও নেই। বলা হয়ে থাকে যে, ধর্ম-ত্যাগে জাগতিক শাস্তি রয়েছে অথচ ইসলামে এমন কথা বলা হয় নি। ইসলাম পরিত্যাগ করতে চাইলে স্বাধীনতা আছে। কাউকে বল প্রয়োগ করে মুসলমানও বানানো যায় না, কলেমা পড়ানোও যায় না। 'লা ইকরাহা ফিদ্দিন' অর্থ এটি নয় যে, নিজ সন্তানদেরকে নামাযের জন্য বলা যাবে না। মহানবী (সা.) বলেছেন, সন্তানদের ১০ বছর পর্যন্ত নামাযের জন্য উপদেশ দিতে থাকো। এরপর যদি নামায না পড়ে তাহলে পরের দু'তিন বছর তাদের সাথে কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শণ করো, তাদেরকে বুঝাও তবে প্রহার করবে না। কিছুটা কঠোর হও, বারবার বুঝাও, ঘুম থেকে জাগিয়ে দাও, জোর করে নামায পড়াও যেন তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরপর যখন তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় তখন তাদেরকে তাদের মত ছেড়ে দাও। কিন্তু রোযা রাখার ক্ষেত্রে কোথাও বয়স উল্লেখ নাই। রোযার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। তবে হ্যা, যদি তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকো, যৌবনে পদার্পন করে থাকো, বিবেক তৈরি হয় তখন অবশ্যই রোযা রাখা আবশ্যক। তবে শিশুদের রোযা রাখার জন্য বলাই উচিত না। আর বলপ্রয়োগের বিষয়টি হল, জোর করে কাউকে ধর্মে প্রবেশ করানোও যাবে না আর কাউকে ধর্ম ত্যাগে বাধাও দেয়া যাবে না। তবে ধর্মের মাঝে থাকলে অবশ্যই ধর্ম পালন করতে হবে।

(সুইডেন থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে প্রিয় হুযূরের মোলাকাত, ১৩ মার্চ প্রকাশিত বিশ্ব বার্তা)

ভাষান্তর: মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
মুরব্বী সিলসিলাহ, বাংলাডেস্ক, ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

১৭তম কিস্তি

১৬তম কিস্তি ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রকাশ হয়েছে।

বাংলাদেশ জামাতের ৫৪তম সালানা জলসা ৪-৬ মার্চ ১৯৭৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসা উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক বাণী প্রেরণ করেন। এটা নিম্নে পত্রস্থ করা হল:

বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫৪ তম জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর

পবিত্র পয়গাম

সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি অবগত হলাম আপনারা শীঘ্র আপনাদের সালানা জলসা করতে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সমাবেশের রূপ ও বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গণসমাবেশ হতে স্বতন্ত্র। সেই জন্য "আসলাম বসলাম, গল্প করলাম এবং চলে গেলাম"-এর মধ্যে দায়িত্ব শেষ হওয়া উচিত নয়। বরং দোয়া ও প্রচেষ্টা এটাই হওয়া উচিত, যে মহান উদ্দেশ্যাবলীর জন্য এই জলসার আয়োজন, এটা যেন পূর্ণ হয়। এই উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে বালক, যুবক এবং বয়স্কগণের তালীম ও তরবিয়ত এবং আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ঘোষণা হল প্রধান। সুতরাং জামাতী সমাবেশের প্রচেষ্টা এটাই হওয়া উচিত যে, যতদূর সম্ভব জামাতের ছোট বড় সকলে এতে যোগদান করবে এবং সর্বক্ষণ হাজির থেকে এর হতে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করবে।

আমরা এক বড়ই গুরত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছি। চতুর্দশ শতাব্দী হিজরী এখন শেষ হতে চলছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই শতাব্দীতেই ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হবার কথা। কতক লোক মাহদী ও মসীহের আগমনে নিরাশ হয়ে বলতে শুরু করছে যে, এতদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সব জাল এবং কোন সংস্কারক আসার প্রয়োজন নেই। এরা নিরুপায়। কারণ আগমনকারী তাদের ধারনা অনুযায়ী আসেন নাই। কিন্তু আপনারা সেই সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান যুগের ইমামকে চিনবার ও মানবার সৌভাগ্য দান করেছেন। আপনারা খুব ভাল ভাবেই জানেন যে, এই সেই যুগ, যখন ইসলাম সকল ধর্মের ওপর প্রধান্য লাভ করবে। ইমাম মাহ্‌দীর জন্য যে সকল যমীন ও আসমানী লক্ষণাবলী প্রকাশিত হবার কথা ছিল, সে সকলই পূর্ণ হয়েছে এবং আগমনকারী এসে গিয়েছেন।

"শুন আকাশের ধ্বনী, এসেছে মসীহ্, এসেছে! শুন যমীনের ধ্বনী, কর্মবীর ইমাম এসেছে !!"

–আওয়াজ আপনাদের কর্ণে এসে পৌঁছতেছে। আপনারা স্বচক্ষে এটা প্রত্যক্ষ করছেন যে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কিভাবে এই খোদায়ী আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনীত হয়ে সৎ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে আপন প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমান যুগের গুরুত্ব এই কথা হতেই উপলদ্ধি করা যায় যে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন যে, সেই ইমাম যখন আবির্ভূত হবেন, তখন প্রয়োজন হলে বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েও তাঁর পতাকাতলে

সমবেত হইও এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাইও। এই হেদায়েত এবং আদেশের মাধ্যমে হুযূর (সা.) এই সবক দিয়েছেন যে, এক নেতৃত্বাধীনে জমা হওয়া এবং জমা থাকার মধ্যে সাফল্য নির্দিষ্ট আছে। জামাতে আহমদীয়ার ব্যক্তিবর্গকে এই সবক শুধু সদা নিজেদের স্মরণে অঙ্কিত রাখলে চলবে না, বরং নিজেদের সন্তান সন্ততি ও বংশধরগণকে এই তাকিদ করে যেতে হবে যে,

"যে ব্যক্তি যুগ ইমামের সাথে মতভেদ করে, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

দ্বিতীয় সবক উক্ত আদেশে এই দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানে ইসলামের প্রাধান্যের

জন্য বড় কুরবানী পেশ করার প্রয়োজন হবে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যদি বরফের পাহাড়ের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে পাড় হতে হয়, তা হলেও এইরূপ কুরবানী হতে পশ্চাদপদ হবে না। এটি সুস্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য যত বড় হবে, এর জন্য প্রচেষ্টা ও কুরবানীও তত বড় আকারে করতে হবে। ঐশী তকদীর আকাশমালায় এবং যমীনে পরিবর্তন সাধন করতেছে এবং সত্যের অনুকুলে সাহায্যের বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই দিন দূরে নয়, যখন প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের অধিবাসীগণ এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপাসক হয়ে যাবে এবং তাঁর পবিত্র কালাম এবং পবিত্র মহানবী (সা.)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করবে এবং সারা বিশ্বে সেদিন একই খোদা হবে এবং একই রসূল হবে। সকল উম্মত নিজেদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে বিলীন করে এক উম্মতে মিশে যাবে এবং উৎপীড়িত মানবমণ্ডলী পুনরায় প্রেম, সৌহার্দ, শান্তি ও শান্তিপ্রিয়তার দৃশ্য অবলোকন করবে। ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য ঐশী তদবীর কর্মতৎপর হয়ে ওঠেছে। এখন আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, এর দিকে আমাদেরকে পূর্ণ মনোসংযোগ করতে হবে। আকাশ যে ধ্বনিকে উচ্চ করতে চাহে, আমাদের রসনা যেন এর প্রকাশে মূক না হয়ে থাকে। বরং সত্যের প্রচারের কাজ যেন পূর্ণভাবে চালু থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে, শুধু আমাদের রসনাই ইসলামের সহি এবং সুন্দর শিক্ষার দাওয়াত দিতে থাকবে, তাই নয়, বরং আমাদের আমল এবং আমাদের কীর্তি দর্পনে এর সৌন্দর্য প্রতিফলিত হতে হবে। আজ দুনিয়ার জন্য সব চেয়ে প্রয়োজন নেক নমুনা। আমাদের জামাতের জন্য ফরয যে তারা এই নেক নমুনা পেশ করবে। যদি আমাদের ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই বিষয়টির গুরুত্বকে স্মরণে জাগরুক রাখে এবং এর ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলে, তা হলে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কাজে দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হবে। আমি দোয়া করতেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের বংশধরদেরকে স্ব স্ব দায়িত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার এবং যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দিন এবং আমাদের সম্মেলন সমূহকে সকল দিক দিয়ে বরকতপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ করুন। আমীন।

মির্যা নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস
(পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ/১৯৭৭)

বাংলাদেশ জামাতের আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব ৪ মার্চ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তিনি ভাষণে বলেন–

আল্লাহ্ তা'লার পরম অনুগ্রহে দীর্ঘ ৬ বছর পর গত ডিসেম্বর মাসে রাবওয়া মোকামে আমাদের বিশ্ব সালানা জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য এ অধমের হয়। তদুপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর সাথে এই আজেযের সাক্ষাতের সময় হুযূর আকদাস এই আজকে দু'টি আদেশ দেন।

১। ঢাকায় মসজিদ নির্মাণ করা এবং ২। জামাতকে সালাম জানিয়ে দোয়া করতে বলা, যেন হুযূর আকদাস (আই.) বাংলাদেশ জামাত পরিদর্শনে আসতে পারেন।

আমি এই দু'টি আদেশ আপনাদেরকে জানিয়ে আমার ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করলাম। কিন্তু এই দু'টি কথা আপনাদেরকে শুনিয়ে বা আপনারা এই দু'টি কথা শুনে আমার বা আপনাদের কর্তব্য শেষ হল না। বস্তুত: উক্ত দু'টি আদেশের ফলে দোয়া ব্যতিরেকে আমাদের ওপর দু'টি গুরু কার্যভার ন্যাস্ত হয়েছে। একটি হল মসজিদ নির্মাণ এবং অপরটি হল (আই.)-এর এস্তেকবালের জন্য প্রস্তুতি। দুইটিই বড় মোবারক কাজ। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরগাহে আমাদের সকলের বিশেষ দোয়া, কুরবানী ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।

মসজিদ নির্মাণের কাজ ও হযরত আকদাস (আই.)-এর এস্তেকবাল যেহেতু একটি অপরটির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাই উভয় কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি করা হল।

কমিটির মেম্বারগণের নাম:

১। ডা: আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী– চেয়ারম্যান

২। মৌলবি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান– সেক্রেটারী

৩। মৌলবি ভিজির আলী– মেম্বার

৪। মৌলবি আলী কাশেম খান চৌধুরী– মেম্বার

৫। মৌলবি শহীদুর রহমান– মেম্বার

৬। মৌলবি মকবুল আহমদ খান– মেম্বার

৭। মৌলবি বি, এ, এম, এ, সাত্তার, চট্টগ্রাম– মেম্বার

৮। মৌলবি আব্দুস সাত্তার ঢাকা– মেম্বার

৯। মৌলবি তবারক আলী– মেম্বার

১০। মৌলবি শামসুর রহমান, বার-এট-ল– মেম্বার

১১। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী– মেম্বার

১২। মৌলবি নূরুদ্দীন আহমদ, ঢাকা– মেম্বার

সকর ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট আবেদন, হযরত আমিরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর পয়গামের আলোতে ও অনুসরণে আপনারা আপনাদের ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পূর্ণভাবে দ্রুত পালনে ও পূরণে সচেষ্ট হবেন এবং সদা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ায় রত থাকবেন, যাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে পালনে সক্ষম হই। আমীন! *(পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ, ১৯৭৭)।... (চলবে)*

ঐশী উত্তরাধিকার আহমদিয়া মুসলিম জামাত তেরগাতী ও একজন পুণ্যাত্মা সৈয়দ মুজবেহীন আলী

সৈয়দ সোহেল আহমেদ

(শেষ কিস্তি)

সৈয়দ মুজবেহিন আলী যখন আহমদীয়াত কবুল করেন তার ঈমান আনার কথা শুনেই প্রথম সৈয়দ খুর্শিদ আলী তার বড় ভাই কোন প্রশ্ন না করেই বয়আত করেন, যদিও তিনি হযরত রইসউদ্দিন (রা.)-এর বাড়িতে তেমন যেতেন না। কারণ তিনি জানতেন এই ভাই কখনও কোন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না। তিনি বনগ্রাম হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেও চাকরি না খুঁজে যেহেতু সত্য পেয়ে গিয়েছিলেন তাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী (ওয়ালা আহসানু কাউলান দায়ী ইলাল্লাহে) দায়ী ইলাল্লাহ হওয়ার জন্য ধর্মীয় কার্যাদিতেই বেশি মনোনিবেশ করেন এবং তবলীগ শুরু করেন। প্রভাবশালী হিন্দু মুসলমানদের বাড়িতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতা, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এ যুগের কল্কি অবতার সমন্ধে আলোচনা করতেন, অনেকে বিরক্তবোধ করলেও তিনি তার কাজ চালিয়ে যেতেন। যারা প্রথম দিকে আহমদী হয়েছিলেন তারা সময় দিত না বলে তারা যখন হালচাষ করতেন, তিনি হালের পিছু পিছু হাটতেন ও তবলীগ করতেন।

তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমার তিনটি স্থানে কিছুসংখ্যক পুণ্যাত্মা আহমদীয়াত কবুল করেন ধনকীপাড়া (নাগেরগাও), তেরগাতী ও তাতার কান্দি। সংখ্যায় অল্প হওয়াতে তাতারকান্দিতে ঈদের নামায হতো। কুরবানী করার লোক কম হতো বিধায় নিজেরা প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও ট্রেনে করে কুলিয়ারচরের তাতারকান্দি গিয়ে ঈদের নামায পড়ে কুরবানির কাজ শেষ করে তারপর বাড়িতে এসে নিজেদের কুরবানী করতেন। আমার নানু সরাইল মীরবাড়ির মীর ওসমান আলী সাহেবের স্ত্রী সৈয়দা আমাতুর রহমান সাহেবার কাছ থেকে শুনেছি এই দুই ভাই এত শক্তিশালী ছিল যে, একটি বড় গরুকে দুইজনেই কুরবানির জন্য শুইয়ে ফেলতো।

সৈয়দ খুর্শিদ আলী সাহেব বিয়ে করেন বাজিতপুরের বড় পীর সৈয়দ আবদুর রউফ মগল মিয়ার ভাতিজি সৈয়দা যুবায়দা বেগমকে। তার শ্বাশুড়ি হল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ফুপু শ্বাশুড়ি। বাজিতপুরের দিলালপুরের এই বাড়িতে এখন মগষ মিয়া সাহেবের মৃত্যু দিবসে চৈত্রমাসের প্রথম বুধবার থেকে সপ্তাহব্যাপী ওরসে লাখো মানুষের সমাগম ঘটে অল্প বয়সে দাদুর সাথে আমরাও এই মেলায় অনেক গিয়েছি। সৈয়দ মুজবেহিন আলী সাহেবের পিতাও বড় পীর ছিলেন। তাদের মুরিদরা যখন আসতো তাদেরকেও তিনি তবলীগ করতেন। আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি বাজিতপুরের এডভোকেট আনিসুর রহমান সাহেব বলেছিলেন উক্ত পীর সাহেবও আহমদীয়াত সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। এডভোকেট সাহেবের সাথে পীর সাহেবের কানেকশন ছিল।

মীর ওসমান আলী সাহেব সাবেক ন্যশনাল আমির মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের পিতা প্রত্যহ ভোরে ফজর নামাযের পর বেশ উচ্চস্বরে ইংরেজীতে অনুবাদসহ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নানার বাড়ি সরাইলে যখন যেতাম তিনি ডেকে বসাতেন প্রথমে নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করে তারপর গল্প করতেন সৈয়দ মুজবেহিন ও সৈয়দ খুর্শিদ আলী সাহেবের কথা। তিনি বলতেন, আমি দুইজনকেই দেখেছি খুবই বলিষ্ট, সুন্দর, অনেক লম্বা, চমৎকার ব্যবহার, নৈতিক গুণসম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল। আমি তাদের নাতি হওয়াতে তিনি বলতেন, তোমাদেরকের এদের মতো উন্নত নৈতিক গুনসম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারি, ধর্মভীরু ও ভালো মানুষ হতে হবে।

আমি পূর্বেই লিখেছি, আমার ফুফা যার বয়স প্রায় ১০২ বছর তিনি বলেছেন তার কাজই ছিল মানুষকে ধর্মের কথা বুঝানো। সৈয়দ মুজবেহিন আলী সাহেব প্রায়ই রইসউদ্দিন খান সাহেব (রা.)-র কাছে যেতেন এবং ছোট ছোট তবলীগি বৈঠক করতেন নাগেরগাওয়ের নুরুদ্দিন খান সাহেবের মাতার সাথে দেখা করার জন্য নাজিমউদ্দিন রোডের বাসায় গেলে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলার পর তিনি এত বয়স হওয়ার পরও আনন্দিত হয়ে সৈয়দ মুজবেহিন আলী সম্পর্কে বলেন তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। প্রায়ই রইসউদ্দিন খান সাহেব (রা.)-র কাছে যেতেন এবং কোন অনুষ্ঠানে গেলে মাছ

মাংস যাই রান্না হতো তার বড় অংশ দুই ভাইয়ের জন্যই রাখা লাগতো।

তার তবলীগে কটিয়াদি তেরগাতীর আশে পাশে বেশ কিছু লোক আহমদীয়াত কবুল করেন। যারা প্রথমে আহমদী হন বেশির ভাগই প্রভাবশালী ছিল বিধায় তেমন মোখালেফাত হয় নি আহমদী নন অ-আহমদীদের মধ্যে বেশ সুসম্পর্ক ছিল যাতে তার অবদান বেশি ছিল। সৈয়দ খুর্শিদ আলী সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে এবং সৈয়দ মুজবেহীন আলী ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তবলীগি সভা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দু'ভাই-ই অল্প বয়সে মারা যান ফলে বয়আতের গতিও থেমে যায় এবং তরবীয়তের অভাবে ও সামাজিক চাপে অনেকে ঝরে পড়ে।

তারা যখন মারা যায় তখন সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের বয়স মাত্র ৪/৫ বছর তখন এই অঞ্চলে প্রচার ও প্রসার কমে যায়। তার মাতা সৈয়দা যুবায়দা বেগম তার একমাত্র পুত্রকে তার চাচার মত নৈতিকতা শিক্ষা দেন। তিনি এত লেখাপড়া করেন নি কিন্তু খুব পরহেযগার মহিলা ছিলেন তার এক ভাই জামাতে ইসলামীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা ছিলেন এবং সংগ্রাম প্রেস ও প্রথমে তার মালিকানায় ছিল। তিনি সবসময় তার বোনকে আহমদীয়াত ত্যাগ করানোর জন্য চেষ্টা করতেন আর তিনি বলতেন যদি তোমার ভাগ্নেকে বুঝাতে পারো তবে আমি চিন্তা করবো। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন কটিয়াদিতে এসেছিলেন তখন তার হাতে রান্না করা খাবার খাইয়েছেন। হুযূর (রাহে.) খাবারের অনেক প্রশংসা করেছিলেন। সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময় থেকেই মসজিদের ইমামতি শুরু করেন এবং জামাতের লোকদেরকে চাঁদার প্রতি আগ্রহ তৈরি ও তরবীয়তের কাজ করে যান।

বাল্লা থেকে কটিয়াদির হালুয়াঘাটে যখন আহমদী ভাইবোনেরা এসে বসতি স্থাপন করে তখন আবার প্রচারে গতি আসে এবং প্রেমারচর, আলগীরচর, রামপুর, বেতাল এসব এলাকায় আহমদীয়াতের বিস্তৃতি ঘটে। তারা পরবর্তীতে আবার আহমদনগরে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ আনোয়ার সাহেব ও তার চাচার মতো তবলীগের দিকে খুব মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রথমে ২/৩টি চাকরি পেয়েও চাকরি না করে ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল হওয়ার জন্য রাবওয়া গমন করেন। দুই বছর কাজ করেন ও পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রি অফিসে কাজ শুরু করেন। তার কাছে প্রচুর মানুষ আসা যাওয়া করতো কেউ বিচার আচারের জন্য বা জমি সংক্রান্ত কাজের জন্য তিনি ১০/১৫ মিনিট সেসব কাজ শেষ করেই শুরু করতেন তবলীগ। কটিয়াদিতে জনাব এজাজুল হক কবিরাজ সাহেবের দোকানে কটিয়াদি থানার সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বসতেন ও গল্প করতেন। তিনি আহমদী হওয়ার পর হতে রেজিষ্টি অফিসের কাজ শেষ করেই তার দোকানে চলে যেতেন আসরের নামায পড়ে বেশিরভাগ দিনেই ঐখানে বসে দুইজনে মিলে তবলিগ করতেন তৎকালিন কটিয়াদির এমপি চেয়ারম্যন শিক্ষক সহ সকল জ্ঞানী-গুনী প্রভাবশালীরাই ঐ দোকানে যেতেন এবং সরারসরি আহমদী না হলেও সহমত পোষণ করতেন।

আমি যখন এই লেখাশুরু করি তখন তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু গত ১৪/০৬/২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তেরগাতীতে নতুন করে কিভাবে বড় মসজিদ তৈরী করবেন সেই ব্যপারে চিন্তা করতেন। এখন জামাতের সদস্য ১৯০ এর অধিক তিনি চাইতেন আহমদীরা এমন ভালো হবে যে, কোন তৃতীয় পক্ষ যেন কোন বিষয়ে নাক গলাতে না পারে তাদের চরিত্র যেন অনুকরণীয় হয় এই ব্যপারে সব সময় চেষ্টা করতেন। তার বয়স প্রায় ৮৩/৮৪ বছর ছিল কিন্তু কোন মুরব্বী মওলানা বা জামাতের কোন মেহমান আসলে খুবই সম্মান করতেন এবং সবাইকে বলতেন আমরা যে দুর্বল কেউ যেন না বুঝে বরং নিজে থেকে চেষ্টা করতেন যাতে সকল সদস্য নেক ও ঈমানদার হয়।

ঐশী উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিতে হলে এবং নতুনপ্রজন্মকে তা ধরে রাখতে হলে তবলিগ ও তরবিয়তের কোন বিকল্প নাই।

কুরআন-হাদিসের শিক্ষাসহ ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে হলে ধর্মীয় পড়াশোনার পাশাপাশি বুযূর্গদের জীবনী অনুসরণ করতে হয়।

তাই আমরা বাঙ্গালী জাতি হিসেবে যদি কুরআন হাদিস, নবী রসূলের জীবনাদর্শের পাশাপাশি হযরত আহমদ কবির নুর মোহাম্মদ (রা.), রইসউদ্দিন খান (রা.), সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (রহ), সৈয়দ মুজবেহিন আলী (রা.)-সহ যেসব বুযূর্গ প্রথম জামানায় প্রচুর পরিশ্রম করে গেছেন এবং শিক্ষনীয় আদর্শ রেখে গেছেন তাদের জীবন কর্ম অনুসরণ করে সেই ঐশী উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে নিজে ও দেশের মানুষকে সত্য বুঝতে সহায়তা করতে পারি।

বাংলাদেশের প্রথমদিকে যে কয়েকটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে তেরগাতী জামাত একটি। বর্তমানে আমাদের মসজিদটি আধাপাকা। সকলের একসাথে নামায পড়ার সময় স্থান সংকুলান হয় না বিধায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা দরকার। জমি অনেক থাকলেও সামনে মাঠ রেখে মসজিদ বড় করতে সমস্যা বিধায় আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বর্তমান ন্যশনাল আমীর আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও দোয়ার মাধ্যমে প্রায় তিন-চার বছর চেষ্টা করার পর মসজিদ বড় করার জন্য আগের জায়গা সংলগ্ন জমি কেনা হয়েছে। আমরা সকল আহমদী ভাইবোনের কাছে সৈয়দ মুজবেহিন আলী (রা.) ও তেরগাতী জামাতের জন্য দোয়ার দরখাস্ত করছি। এই জামাতটি হযরত রইসউদ্দিন খান (রা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে সৈয়দ মুজবেহিন আলী সাহেবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তাই যাতে এই জামাতের লোকজন সেই ঐশী উত্তরাধিকারকে উন্নত মর্যাদার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং জামাতের সকল আহমদী ভাইবোনেরা যেন উত্তম চরিত্রের অধিকারি হয় এই দোয়া প্রার্থনা করে এখানেই শেষ করছি।

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

পূর্ব প্রকাশের পর

ক্রোধ সংবরণ কর

পারিবারিক সমস্যা যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে সেজন্য উভয়পক্ষেরই উচিত নিজেদের রাগ দমন করা এবং ক্রোধ সংবরণ করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

“অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আমি পুনরায় বলছি, গোপনীয়তাও তখনই রক্ষা হয় যখন রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে আর খোদাভীতি থাকলেই এটি সম্ভব। এজন্যে এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার পোশাকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

অর্থাৎ হে আদমসন্তান! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখে এবং যা সৌন্দর্যেরওকারণ। আর থাকল তাকওয়ার পোশাক! এটি সর্বোত্তম (পোশাক)। এগুলো হল আল্লাহ্ তা'লার কতক আয়াত যেন তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা আল আরাফ: ২৭)*

এখানে পুনরায় সেই বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে যা আমি পূর্বেও বলে এসেছি আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পোশাক দান করেছেন তোমাদের নগ্নতা ঢাকার জন্য এবং তোমাদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। এ তো হল বাহ্যিক উপকরণ যা প্রধানত আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র করার জন্য, অর্থাৎ একটি পোষাক দিয়েছেন যার মাধ্যমে তার সৌন্দর্যও প্রকাশ পায় আর নগ্নতাও ঢাকা পড়ে; কিন্তু একই সাথে তিনি বলেছেন, প্রকৃত পোশাক হল তাকওয়ার পোশাক।

এখানে আমি আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট করে দিতে চাই আর তা হল, একজন মু'মিন এবং যে মু'মিন নয় এমন ব্যক্তিদের পোশাকের সৌন্দর্যের মান ভিন্ন হয়ে থাকে। যেকোন ভদ্র লোকের পোশাকের সৌন্দর্যের মান ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল পাশ্চাত্যে বরং প্রাচ্যেও ফ্যাশনেবল ও বস্তুবাদী লোকদের কাছে যদি পোশাকে নগ্নতা প্রকাশ পায় এবং দেহসৌষ্ঠবের প্রদর্শন হয় তবে সেটিকেই পোশাকের সৌন্দর্য মনে করা হয় বরং পশ্চিমা বিশ্বে সর্বস্তরেই এমনটি মনে করা হয়। বলা হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে সারা শরীর আবৃতকারী পোশাকই হল সৌন্দর্য কিন্তু একই পুরুষই কামনা করে যে, নারীর পোশাক যেন এমন হয় যার ফলে দেহ থাকবে অনাবৃত। অধিকাংশ স্থানে মহিলারাও এটিই পছন্দ করে থাকে। যে নারীর আল্লাহ্‌র ভয় নেই তার কাছে পোশাক তাকওয়া নয় আর এমন পুরুষও এটিই চায়। এক শ্রেণির পুরুষ কামনা করে নারীরা যেন আধুনিক পোশাকে সজ্জিত থাকে আর নিজেদের স্ত্রীদের জন্যও এমনটিই পছন্দ করে যেন তাদেরকে উচ্চ শ্রেণির এবং ফ্যাশনেবল মানুষ মনে করা হয়– পোষাক নগ্নতা ঢাকুক বা না ঢাকুক।

কিন্তু একজন মু'মিন এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে কেবল সেই পোশাকই পরিধান করা পছন্দ করবে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয় আর তাকওয়ার পোশাকের অনুসন্ধানে থাকলেই এই পোশাক অর্জিত হবে। যখন বিশেষ সতর্কতার সাথে নিজের বাহ্যিক পোশাকের বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রাখা হবে এবং স্বামী-স্ত্রী যারা পরস্পরের পোশাক, তারাও তাকওয়ার সাথে পরস্পরের প্রতি যত্নবান হবে, তখন সমাজেও একে অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখতে পারস্পরিক সম্পর্কের গণ্ডিতে বিভেদ বা মতভেদ হলে তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রাখা হবে।" *(জুমুআর খুতবা, ৩ এপ্রিল ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০০৯)*

হুযূর (আই.) উল্লিখিত বিষয়টিকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে নিম্নে এভাবে বর্ণনা করেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থাৎ "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।

(সূরা আল বাকারা: ১৮৮)

পুনরায় এ আদেশও দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাক অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরস্পরের গোপনীয়তা রক্ষাকারী। এ শিক্ষাটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। এই গোপনীয়তা সবসময় বজায় থাকা উচিত। ঝগড়া হওয়া মাত্রই একে অপরের অপ্রয়োজনীয় কথা ছড়াতে শুরু করবে, মানুষকে বলতে আরম্ভ করবে– এমনটি হওয়া উচিত নয়। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি সুসম্পর্ক থাকে, সমাজ যদি জানে যে, তাদের মাঝে সুসম্পর্ক রয়েছে, তাহলে সমাজেও স্বামী-স্ত্রীর একটি মর্যাদা বজায় থাকে আর স্বামী-স্ত্রী কারো প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশের কেউ ধৃষ্টতা দেখায় না। অতএব এখানে স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব হল নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তা উপলব্ধি করা। স্বামীর উচিত স্ত্রীর বিশ্বাসকে পদদলিত না করা একইভাবে স্ত্রীরও উচিত স্বামীর আস্থায় ভাটা পড়তে না দেয়া। আল্লাহ্ বলেন, এতে করে অর্থাৎ সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে তোমরা যে কেবল নিজেদের পারিবারিক জীবনকেই স্বস্তিদায়ক করবে তা নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও সুরক্ষিত করবে বা তাদের সুরক্ষার উপকরণ সৃষ্টি করবে। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বামী ও স্ত্রীর বহুবিধ অধিকার এবং আবশ্যিক দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন আর উভয়ের ওপরই এগুলো পালনের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছেন। নারীরাও পুরুষের মতই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তারা দুজনই যদি সঠিক থাকে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সঠিকভাবে উন্নতি করবে আর তাদের যথাযথ তরবিয়্যত বা সুশিক্ষা লাভ হবে। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজ নিজ দায়িত্বাবলী পালনের প্রতি তাদের উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"
(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ অগাষ্ট ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ মে ২০১৫)

এক জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.) মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে বলেন–

"মহানবী (সা.) যেখানে নিজে আমানত ও সততার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেখানে তিনি তাঁর উম্মতকেও নসীহত করেছেন যে, এর দৃষ্টান্ত স্থাপন কর এবং

এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়েও যত্নশীল হও। উদাহরণস্বরূপ 'স্বামী-স্ত্রী'-এর সম্পর্কই নিন। তিনি (সা.) নসীহত করেছেন যে, এ সব সম্পর্ক আমানত হয়ে থাকে, এ সম্পর্কগুলো বজায় রাখতে যত্নবান হও। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লার নিকট সবচেয়ে বড় খেয়ানত (বা বিশ্বাসঘাতকতা) বলে যে বিষয়টি গণ্য হবে তাহল, নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি লোকদের মাঝে বলে বেড়ানো। *(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফি নাকলিল হাদীস)*

বর্তমান সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে কথাবার্তা হয় তা মানুষ তাদের পিতামাতাকে বলে দেয় আর এর ফলে অনেক সময়ে অশান্তি দেখা দেয়। ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পিতামাতারই এমন স্বভাব থাকে যে, তারা তাদের সন্তানের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বের করে আর এরপর তা ঝগড়াবিবাদের কারণ হয়ে যায়। এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ধরণের কথাই হোক না কেন, তারা তা অন্যদের বলার অধিকার রাখে না আর অন্যদেরও তা জিজ্ঞেস করা বা শোনা উচিত নয়।

সবাই যদি এই নির্দেশ মেনে চলে তাহলে আমার মনে হয় অনেক ঝগড়াবিবাদ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে।" *(জুমুআর খুতবা, ১৫ জুলাই ২০০৫, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ অগাষ্ট ২০০৫)...(চলবে)*

(আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্, পৃ. ২৩-২৬)

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

- গত ০৩/০৮/২০২০ মাফরুজা খাতুন, পিতা আরিফ আহমদ, গ্রাম–ধানীখোলা, মধ্যপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ- এর সাথে মোহাম্মদ মাসুন আলী, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন-কাফুরিয়া, নাটোর-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৮৮

- গত ৯/১০/২০২০ আয়শা আক্তার, পিতা- আব্দুল মান্নান হাওলাদার পূর্ব-কাতিনিয়া, বেতাগী, বরগুনা-এর সাথে তৌহিদুল ইসলাম, পিতা- মহিউদ্দিন আহমেদ, সাজাইল, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯১

- গত ১৪/০৮/২০২০ মৌসুমী বেগম, পিতামৃত- সাদেক মিয়া, তারুয়া, বেবুদী, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার-এর সাথে তুষার আহমদ, পিতা- জামাল মিয়া, সিমরাইল কান্দী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৮৯

- গত ১৬/১০/২০২০ সাদিয়া সিদ্দিকা, পিতা- এস, এম, নূরুল্লাহ, গ্রাম- বড়গুরগোলা, পোঃ দিনাজপুর, থানা- সদর, জেলা-দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ সাফি হোসাইন, পিতা- ইব্রায়েতুল হাসান, কল্যাণপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ১০,০০০০১/- (দশ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯২

- গত ৩১/০৭/২০২০ শারমিন সুলতানা রয়েল, পিতা- মোহাম্মদ জালাল আহমেদ, খাকদান, আমতলী, বরগুনা-এর সাথে মোহাম্মদ সজীব হাওলাদার, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান হওলাদার, পূর্ব কাতিনিয়া, বরগুনা-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯০

- গত ০৯/১০/২০২০ মোসাম্মৎ সুবর্না খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সাং গজেন্দ্র চাপিলা, গুরুদাসপুর, জেলা-নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ আরিফ আহাম্মেদ, পিতা- আবুল খায়ের, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৯৩

কবিতা

জামেয়া আহমদীয়া

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপিয়া
সপ্ত আকাশ ছাপিয়া,
আল্লাহু আল্লাহু সুরে
হামদ ও সানা গাহিয়া।
ছুটছে বেগে প্রলয় তেজে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়া।
জামেয়া আহমদীয়া (৬ বার) ॥

তোতা হতে চাই কুরান পড়ে
গাইব শুধু এই স্বরে,
কোকিলের গান কণ্ঠে আমার
গুনগুনিয়ে যায় সুরে।
বাজের মত ঊর্ধ্বাকাশে রুহানিয়াতের আকাশে
নামব ধরায় মানবেরে দিতে পথের দিশা।
জামেয়া আহমদীয়া (৬ বার) ॥

সৌরভে যেন গোলাপ হারে
রজনীগন্ধা গৌরবে
মল্লিকা বেলী গাদা চাঁপা জুঁই
হাসনাহেনা বৈভবে।
পদ্ম হয়ে পঙ্ক মাঝে ইসলামের সভ্যতা
সিদরাতুল মুনতাহা আমার দ্বীনের নবীর উচ্চতা।
জামেয়া আহমদীয়া (৬ বার) ॥

যুগ খলিফার সৈন্য হয়ে
আমলের ময়দানে,
মুহাম্মদের চরণ সেবায়
সাত সাগর মন্থনে।
তীব্রবেগে বাইব তরী যুক্তিবাদী তীর হেনে
দিগ্বিজয়ী হব আমরা সাহস হ্রেষা হাঁকিয়া।
জামেয়া আহমদীয়া (৬ বার) ॥

ভালবাসা সবার তরে
বিলাইতে অকাতরে,
মুহাম্মদের মসিহর পতাকা
গাঁয়ে শহরে বন্দরে।
চিনে নিও সব পাঠালেন রব মুহাম্মদ মুস্তফা
সাইয়্যেদুল কাউনাইন যার অপার কুদরতে কুদসিয়া।
জামেয়া আহমদীয়া (৬ বার) ॥

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা
মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলে মুহাম্মদ,
আসল গোলাম মহানবির
মির্যা গোলাম আহমদ।
নতুন আকাশ নতুন জমিন নতুন মানবের শিফা
ওয়া আশরাকাতিল আরদ্ব বি নুরি রাব্বিহা।
জামেয়া আহমদীয়া (৬ বার) ॥

*****

সংবাদ

বীরপাইকশা জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের বীরপাইকশা জামাতের স্থানীয় মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মৌ. ফজলুল হক কারী। নযম পরিবেশন করেন রিফাত আহমদ, বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. নঈম আহমদ বক্তব্যের বিষয় ছিল দরূদ শরীফের কল্যাণ তারপর বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এরপর বক্তব্য রাখেন জেনারেল সেক্রেটারী জানে আলম (মনি) বক্তব্যের বিষয় ছিল মহানবীর ইনসাফ ও ন্যায় বিচার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল মহানবীর জীবনের আদর্শ। এরপর বক্তব্য রাখেন জেলা ইনচার্জ মাওলানা মাসুদ আহমদ (বিপ্লব) তার বক্তব্যের বিষয় ছিল মহানবীর মহানুভবতা। জলসায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ এমদাদুল হক (গোলাপ)। জলসায় উপস্থিত ছিলেন মোট ৪১ জন পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জেলা নাযেম, বীরপাইকশা জামাত

তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ-এর ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২০/১১/২০২০ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব মসজিদ মাহমুদ কোড্ডাতে জনাব মোস্তক আহমদ ভূয়া প্রেসিডেন্ট কোড্ডার সভাপতিত্বে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ-এর ওপরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনা ইশতিয়াক আহমদ নিজন এর কুরআন তিলাওয়াতের ও সাকিব সারোয়ার সপ্রীম এর নযম পরিবেশনের পর সভার বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে জনাব এনামুল হক ইন্টু এবং মৌলবী আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম কোড্ডা। পরিশেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান বক্তৃতার পর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্ত ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন।

এনামুল হক ইন্টু

“আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপাত্র “আহমদী” পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **প্রকাশক**, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

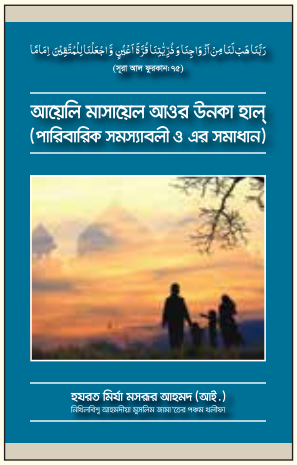

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর খিলাফতের সূচনালগ্ন থেকে ২০১৩ সন পর্যন্ত বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতায় প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া পারিবারিক অঘটন ও দ্বন্দের কথা উল্লেখ করে এর প্রতিকার ও সমাধানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ, কার্যকর ও যুগোপযোগী অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যা সফল পারিরবারিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। লাজনা সেকশন মার্কাযিয়া, যুক্তরাজ্য অমূল্য সেসব নির্দেশনা সংকলন করে **"আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্"** নামে একটি পুস্তক সিদ্ধান্ত একটি পুস্তক প্রকাশের তৌফীক পাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। পুস্তকটি বাংলা ভাষায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পুস্তিকা লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও নাসেরাতের সকল সদস্যের জন্য তো বটেই বরং প্রতিটি পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান পুস্তক হিসেবে সাব্যস্ত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আহমদী পরিবারগুলো জান্নাত-প্রতীম হবে এটিই আমার প্রত্যাশা। আল্লাহ্ তা'লা এই পুস্তক থেকে সকল আহমদীকে উপকৃত হবার তৌফীক দান করুন, আমীন।

পুস্তকটি বাংলাডেস্কের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুদিত হয়েছে। উক্ত পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ-মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন অনেক বেশি আনন্দঘন, সহজ ও গতিময় হয়ে উঠেছে। এখন বছরের কাজ দিনে আর দিনের কাজ ঘন্টায় বা মিনিটে করা সম্ভব, চোখের পলকে সংবাদ পৌঁছে যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। যার ফলে মানুষের ভাব বিনিময় থেকে শুরু করে জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসার, সংবাদ ও প্রয়োজনী তথ্যাদির প্রচার প্রচারণা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের অপব্যবহারে ফলে ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর সব বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, যার ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনে। প্রযুক্তির এই করালগ্রাস থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে এবং এর সঠিক ব্যবহারে অনুপ্রাণীত করতে যুগের পথপ্রদর্শক হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ(আই.) বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এই বিষয়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ (অর্থাৎ আমাদের জামাতের মহিলা সংগঠন) সেগুলো সংকলন করে **'সোশাল মিডিয়া'** নামে উর্দুভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

আত্মসংশোধনমূলক এ অমূল্য পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করায় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বাংলাডেস্ক-এর কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন করেছেন। উক্ত পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

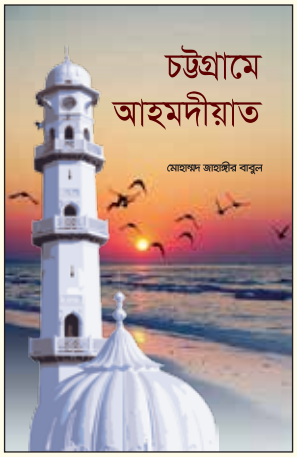

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। পাহাড়-উপত্যকা ও বঙ্গোপসাগরের সমন্বিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য প্রাচ্যের রাণী হিসেবে খ্যাত। বঙ্গদেশে সবচেয়ে প্রথমে যেভাবে চট্টগ্রামের পথ ধরে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে ঠিক সেভাবে এই পথ দিয়েই বাংলাদেশে এ যুগে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের আগমন ঘটেছিল। এখানে শতবর্ষ আগে আহমদীয়াতের বীজ বপিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। আহমদীয়া মতবাদ বাঙালি ও পাহাড়িদের মাঝে বিস্তৃত হয়েছে।

চট্টগ্রামে আহমদীয়াতের ক্রমবিকাশ এবং এর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বুযূর্গদের অবদান তুলে ধরার মানসে জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল 'চট্টগ্রামে আহমদীয়াত' পুস্তকটি রচনা করেছেন। এসব বুযূর্গদের কুরবানী আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ন্যায় ও সত্যের পথে নানা সংকট উত্তোরণে এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে তাঁরা আমাদের জন্য আদর্শ। চট্টগ্রামে আহমদীয়াতের ইতিহাস জানার জন্য পুস্তকটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট সমাদৃত হবে বলে আশা করি। পুস্তকের লেখক ও এর প্রকাশনায় যারা যেভাবে কাজ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

উক্ত পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 83 | 9th & 10th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th November, 2020 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

Hakim Water Technology & Filter House

Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)

OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Hbibullah**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)